ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 16, No. 2, December 2019

S R Lahiri Mahavidyalaya, Majdia
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 16, No. 2, December 2019

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Tapas Basu
Ex. Professor, Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নির্মিতি

সুনির্মল বিশ্বাস ৩

ক্ষীরোদপ্রসাদের উলূপী : মিথ-পুরাণের প্রয়োগ ও পর্যালোচনা

তুষার পটুয়া ১৩

আসামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

নয়ন সরকার ও তপন কুমার বিশ্বাস ১৮

প্রসঙ্গ জনস্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা ঃ প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলা

পলাশ দে ২৩

শান্তিপুরের রাস বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলনক্ষেত্র

অভিষেক প্রামাণিক ৩১

'পাতাল-কন্যা মণিমালা' : গল্প ও শৈলীবিচার

অর্ঘ্য হালদার ৩৫

পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাসে নারীর ভুবন

কৃষ্ণা ঝুল্কী ৫১

Transit Route of Bengal Kansaris : A Study

Alok Kumar Biswas 59

উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নির্মিতি

সুনির্মল বিশ্বাস

বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষণে। একদিকে বঙ্কিমীযুগের শেষ, অন্যদিকে রবীন্দ্রযুগের শুরু। 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২/১২৯৯ ব.) তাঁর প্রথম উপন্যাস। এছাড়া, আরও চারটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন। সেগুলি যথাক্রমে—সেকালের কথা (১৩০১ ব., অতি ক্ষুদ্র উপন্যাস), ফোকলা দিগম্বর (১৩০৭ ব.), ময়না কোথায় (১৩১১ ব.) এবং পাপের পরিণাম (১৩১৫ ব.)। আমরা জানি, কথাসাহিত্য রচনায় সমাজের একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। সেখানেই কথাশিল্পী লালিত-পালিত হন। ত্রৈলোক্যনাথের (১৮৪৭-১৯১৯) জীবনের বেশিরভাগ সময়টুকু উনিশ শতকে অতিবাহিত হয়েছে। তৎকালীন ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্তনগুলির প্রতি তিনি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই উপন্যাসগুলিতে তাঁর সেই যাপিত জীবনের ছায়া পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, উপন্যাসে রীতি ও প্রকরণগত ভাবনায় একটু ভিন্নপথে চালিত হয়ে উনিশ শতকের শেষলগ্নে তিনি লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'। বঙ্কিম-প্রদর্শিত উপন্যাসরীতি তিনি গ্রহণ করেননি। তৎকালীন সময়ে সমাজ ব্যবস্থায় এমন অপ্রিয় কিছু লক্ষ্য করেছিলেন, যা মোটেই তাঁর কাছে প্রীতিকর ঠেকেনি। ফলে প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সংমিশ্রণে উপন্যাসে এমন জগৎ নির্মাণ করলেন, যার চলন-বলনভঙ্গির অভিনবত্বে পাঠকসমাজ চমকে গেল। প্রশ্ন হল, ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী' রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমীধারা অনুসরণ না করে কেন নতুন উপন্যাসশৈলীর সন্ধান করলেন? তবে শুধু 'কঙ্কাবতী'তে নয়—'ময়না কোথায়', 'পাপের পরিণাম' প্রভৃতি উপন্যাসেও এই প্রবণতাটি দেখা যায়।

উনিশ শতক বাঙালির জাতীয়তাবোধ জাগরণের কাল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেদিনের বঙ্গ সন্তানেরা অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার লুপ্তপ্রায় অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে বাঙালি গৃহস্থের গোশালায় অযত্নে পড়ে থাকা জীর্ণ পুঁথিপত্র কিংবা গ্রামীণ স্নেহময়ী দিদি-ঠাকুরমাদের দেশীয় মৌখিক গল্পকথার মধ্যেই রয়েছে সেই ইতিহাস রচনার রসদ। উনিশ শতকে সংস্কৃতি-সচেতন সাহিত্যিকদের রচনাতে দেশীয় ঐতিহ্যের পুনর্গঠনের প্রয়াস দেখা যায়। ছাপাখানার দৌলতে গদ্যভাষাকে বাহন করে প্যারীচাঁদ মিত্র, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে উপন্যাস সিদ্ধিলাভ করল। তিনি উপন্যাস রচনায় ইংরেজি আদলটিকে গ্রহণ করেছিলেন। কাব্যময় বাংলাদেশের বাঙালি সাহিত্যপাঠক তা পাঠ করে এতটাই মুগ্ধ হলেন নতমস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্যসম্রাট' রূপে স্বীকার করে নিলেন। বঙ্কিমী-প্রভাবমুক্ত সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেওয়াটা তাঁদের কাছে নিতান্তই অবঙ্কিমী ঠেকেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ এই প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৃজন করলেন দেশজ রূপকথাশ্রিত উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'। দুর্ভাগ্য সাহিত্যে তাঁর এই ব্যতিক্রমী ভাবনার মর্যাদা অধিকাংশ সমালোচকই দেননি। হয়তো বঙ্কিমের আমদানিকৃত প্রতীচ্যধারা দেখে অভ্যস্ত এইরকম সমালোচকদের মনে হয়েছিল তাঁর 'কঙ্কাবতী' নিতান্তই শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত। উপন্যাস পদবাচ্য তা হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে সাধনা পত্রিকায় কঙ্কাবতীর সমালোচনায় লেখেন—"... এতদিন পরে বাংলায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।"[১] জাতীয়তাবাদী ত্রৈলোক্যনাথ বুঝেছিলেন ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেই আধুনিক উপন্যাসের বীজটি নিহিত আছে। নিজেদের অজ্ঞতাজনিত কারণে হয়তো আমরা দেশজ কাহিনিকে উপেক্ষা করেছি। এতটাই পাশ্চাত্যঘেঁষা হয়ে পড়েছি যে এগুলির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আমরা বুঝতেই পারিনি। তাঁর এই স্বদেশি ভাবনার বহিঃপ্রকাশ 'কঙ্কাবতী', 'ময়না

বিশ্বাস, সুনির্মল : উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নির্মিতি
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 3-12, ISSN 2249-4332

কোথায়', 'পাপের পরিণাম'। নিজের ঘরে পর্যাপ্ত রত্ন থাকতে পরের কাছে তিনি হাত পাততে চাননি। উনিশ শতকে দেশজ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ-প্রদর্শনময় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বাঙালিচিত্তে নতুন প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চার করেছিল। দেশজ উপাদানে রচিত উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক যেমন সুকৌশলে ইংরেজের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তির্যক প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তেমনই সমকালীন সমাজের অন্ধ পাশ্চাত্যপন্থীদের পিঠে ব্যঙ্গের চাবুক মেরে সবক শিখিয়েছেন। বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে গিয়ে নারীমুক্তির বার্তা দিয়েছেন। সেকালে এমন ভাবনা সত্যিই বৈপ্লবিক। এ প্রসঙ্গে মনে আসে লাতিন আমেরিকার নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের রচনারীতির কথা। তিনি সাহিত্যে ইউরোপীয় আদল বর্জন করে তাদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। দলিত লাতিন আমেরিকাবাসীর প্রতিনিধি হয়ে কলম ধরেছেন। ঔপনিবেশিক বাস্তবতা থেকে জাতির মুক্তির পথ খুঁজতে মার্কেজ তাঁর দেশের লোকসংস্কৃতির জগতে পদচারণা করতে গিয়ে স্বপ্ন-বাস্তবের মিশেলে নান্দনিক তাৎপর্যে উপন্যাসশিল্পে 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা'র (ম্যাজিক রিয়ালিজম) জন্ম দিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথ পরাধীন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর অনেক আগেই 'কঙ্কাবতী'র মাধ্যমে কথাসাহিত্যে নান্দনিক প্রতিবাদ করেছেন। দুজনে আলাদা ভাষা, আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা মহাদেশের মানুষ হয়েও কোথাও নান্দনিকতার আড়ালে যেন ইউরোপের শাসকের দেশীয় সংস্কৃতির নির্বৈধীকরণের (পলিসি অব ডিকালচারেশন) বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছাপ স্পষ্ট। কাজেই, ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আয়ুধ। চিরায়ত রূপকথার মোড়কে পরিবেশিত উপন্যাস 'কঙ্কাবতী' ছাড়াও 'ময়না কোথায়', 'ফোকলা দিগম্বর', 'পাপের পরিণাম'-এর মত উপন্যাসগুলিতে উনিশ শতকীয় বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের বহুস্বরের সমন্বয় ঘটেছে। আসলে, ''যে মানস পরিবেশে রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত উহার সহজ সহ-অবস্থান, তা প্রচুর পরিমাণে ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে রক্ষিত আছে। এই রূপকথার কল্পনাকে তিনি বাস্তবজীবনের সহিত নূতন সংশ্লেষে মিলাইয়াছেন।''[২]

২

ইতিহাসের পাতা উল্টাতেই মানুষের গঠন প্রকৃতি ও তার পরিবর্তন চোখে পড়ে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক—তা নির্ভর করে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ কাজ-কর্মের উপর। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণিবদ্ধতা থেকে জন্ম নেয় বিশেষ শ্রেণিবৈশিষ্ট্য। এরই সঙ্গে বিকাশ লাভ করে সামাজিক মর্যাদাবোধ। পরে অর্থের সাথে মর্যাদা ও শ্রেণিবিচার এক হয়ে পড়ল। মধ্যযুগে মানুষের জীবনের ভরকেন্দ্র ছিল ভূ-সম্পত্তি। তাই সমাজও ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেক মানুষের জীবনের কর্তব্য-কর্ম থাকত প্রকৃতি নির্দিষ্ট। বংশ ও ভূ-সম্পত্তিই ছিল সামাজিক শ্রেণি নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি। যা বংশানুক্রমিক ভাবে অপরিবর্তনীয়। ভূ-সম্পত্তির হাতবদল কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও ভূ-প্রকৃতির গঠনের তারতম্য ঘটত না। এই কারণে মধ্যযুগের সমাজের কাঠামো ছিল শক্তপোক্ত। আর স্থিতিশীল সমাজে বসবাস করার ফলে মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনাও হয়েছিল দৃঢ়। এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বে সমাজ মোটামুটি এমনই ছিল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পরও প্রায় দশ বছর বাংলায় নবাবী শাসন বহাল ছিল। এরপর ১৭৬৫-তে কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে বাংলায় শুরু হল দ্বৈতশাসন। রাতারাতি বৃদ্ধি পেল রাজস্বের পরিমাণ। আর বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য চলে বাধাহীন লুঠতরাজ। যার অনিবার্য পরিণতি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। দুর্ভিক্ষের আঘাতে বাংলায় কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। অনেক অভাবী চাষি মারা গেলেন। জমিজমা ছেড়ে অনেক চাষি অন্যত্র পালিয়ে গেলে কৃষি জমিগুলি অনাবাদী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে হাঁটে। প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে নিলামের দ্বারা জমিদারীগুলি পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হলেও আশানুরূপ রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হন ইজারাদাররা। এরপর কর্ণওয়ালিশ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৭৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দশশালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। যা পাঁচশালার তুলনায় অনেকটাই সফল হয়। ফলে তিনি ১৭৯৩-এ এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেন। জমিদার,

তালুকদারেরা এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমির স্বত্বাধিকার পেলেন ঠিকই। সূর্যাস্ত আইন থাকার ফলে অনেক জমিদারই নির্দিষ্ট সময়কালের রাজস্ব দিতে না পেরে জমিদারী খোয়ান। যাদের হাতে টাকাকড়ি ছিল তারাই নিলামে সেই জমিদারী গুলি কিনে নিল। এদের অধিকাংশই ছিলেন কলকাতার নব্যধনী—বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও ব্যবসায়ী। বড়ো জমিদারী ভেঙে উদ্ভব হতে লাগল ছোটো ছোটো জমিদারীর। জমিদারের তুলনায় ব্যবসাদারের সামাজিক মর্যাদা অনেক কম। তাই ব্যবসাদাররা নিলামে জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন। জমিদারী পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা সে অর্থে কোনটাই তাদের ছিল না। কলকাতায় গদিতে বসে ব্যবসা সামলাতে হয় বলে তারা শহর-দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে জমিদারী দেখভালের দায়িত্ব অন্যের উপর বর্তান। অনেক জমিদার তাঁর জমিদারী ইজারা দিলেন। আবার সেই ইজারাদারই অন্যের কাছে সেই জমিদারী ইজারা দেওয়াতে জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির। এনারাই উনিশ শতকের সমাজে 'বাবু' বলে পরিচিত হলেন। বাবুরা নিজেদের ধনদৌলত জাহির করতে অনেক সামাজিক কাজকর্ম শুরু করেন। এছাড়া, এই সময়কালের মধ্যে কলকাতায় উত্থান হল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। কোম্পানির প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে ইংল্যাণ্ড থেকে আসা যুবকদের এদেশীয় শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার জন্য উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রি.) স্থাপনার পর দেশীয় উদ্যোগে হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রি.) স্থাপিত হলে পাশ্চাত্যের যুক্তিনির্ভর জ্ঞানচর্চা মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি সমাজে আনে এক নব উন্মাদনা। প্রজ্জ্বলিত নবচেতনার আলোকশিখায় কলকাতার নাগরিক সমাজ উদ্ভাসিত হল। সেখানকার পরিবেশ চলমান জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-বিরোধে মুখর থাকলেও বাংলার গ্রামীণ সমাজে নবচেতনার আলো সেভাবে বর্ষিত হয় নি। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের ভাবনাকে আত্তীকরণ করে বলা যেতে পারে উনিশ শতকই নয়, আজও বাংলার বহু এলাকার মানুষ নানা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমগ্ন।

শহরের তুলনায় গ্রামের গতিধারা অনেকটাই ধীরগতিসম্পন্ন। কারণ গ্রামে জাতিভেদ, কুসংস্কার, ধর্ম ও শাস্ত্রগত সংস্কারের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আমাদের আলোচ্য 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে বর্ণিত কুসুমঘাটী এমনই এক অশিক্ষা, অলৌকিক-অন্ধবিশ্বাসে মোড়া গ্রাম। এখানকার মানুষের বিশ্বাস অশ্বত্থ-বট-বেলগাছে ভূত বাস করে। ডাইনীরা পথে খড়কুটো বেশে পড়ে থাকে। গ্রামের পাশের নদীর জলে জীবন্ত পাথর আছে, সুযোগ পেলেই মানুষের বুকে চেপে বসে। এখানকার বনে একধরনের শিকড় পাওয়া যায়, যা মাথায় ধারণ করলে মানুষ বাঘের রূপ ধরে শত্রুর বিনাশ করতে পারে এবং খুলে ফেললে পুনরায় মানুষ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে জমিদারের দাপট আলাদা করে তো ছিলই। অষ্টাদশ শতকে সারা দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় সংস্কারের চাপ ও ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণে ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা হয়ে পড়ল দিশাহীন। সে পরিস্থিতি জটিল রূপ নিল উনিশ শতকে। সর্বোপরি, গণশিক্ষার অভাবে সেকালের গ্রামীণ মানুষ লোকাচার-দেশাচারকে শাস্ত্রবচনরূপে শিরোধার্য করে বিজাতীয় মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকাটাকে বেঁচে থাকার পথ বলে ধরে নিয়েছিল। শাস্ত্র-নির্মিত খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার পর্যন্ত তার সমাজ তার পৃথিবী। বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানার কোন চেষ্টাই তাদের ছিল না। নানা সংস্কারে ভরা চেনামহলে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। তবে শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্মার্থ সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বুঝত না। সবাই মুখ বুজে শাস্ত্র মেনে আসছে তাই আমরাও মানছি। পণ্ডিতদের অপর্যাপ্ত শাস্ত্রজ্ঞান আপামর মানুষকে শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনের নামে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের মনে একপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল, যে যত আচার-সংস্কার পালন করবে, সে ততবড়ো ধার্মিক হিন্দু। ফলে সমস্ত কাজকর্মেই একটা রক্ষণশীলতার ছাপ পড়ল। বিধর্মী ইংরেজদের ছোঁয়া-খাওয়া থেকে স্বধর্ম রক্ষার্থে তৎকালীন সিংহভাগ মানুষ একপ্রকার জানপ্রাণ বাজি রেখে শাস্ত্র-সংস্কারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় হিন্দু সমাজপতিরা নিজেদেরকে আরও বড় হিন্দু প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। এদের কাছে সমুদ্রযাত্রা একেবারেই শাস্ত্রনিয়ম-বহির্ভূত। কেননা, সেখানে বিধর্মীদের সহাবস্থান। সমুদ্রযাত্রা করলে জাতি-কুলধর্ম লোপ পাবে।

'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে কঙ্কাবতীর পিতা তনু রায়ের মায়ের সমুদ্রদর্শনের বাসনা জাগলে তনু রায় নিজের মাকে সমুদ্রযাত্রা থেকে বিরত রাখেন। আর বিধর্মীর প্রস্তুত আহার্য ভক্ষণ অপরাধই নয়—রীতিমত পাপ। খেতু সাহেবদের কলে

গো-রক্ত দিয়ে প্রস্তুত বরফ খেয়েছে—এই মিথ্যা অপপ্রচারের ফলে গ্রামের মানুষ খেতুকে একঘরে করে দেয়। 'ময়না কোথায়' উপন্যাসে নরোত্তম মাশচটকের কার্যকলাপ থেকে ভালোই বোঝা যায়—''যেদিন হইতে মাশচটক মহাশয় ভগবতীর ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, সেইদিন হইতেই তিনি ঘোর হিন্দু হইয়া পড়িলেন।.... ক্রমে বাড়ীতে তিনি গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন।''[৩] আবার 'পাপের পরিণাম' উপন্যাসে বিনয়ের বর্ণিত পুণ্ডরীক ভট্টাচার্যও শুদ্ধচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কলের জলের পরিবর্তে গঙ্গাজলে রান্না খাওয়া করতেন। তাই খাদ্য বিচার এক্ষেত্রে একটা মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। বয়স্কদের কথায় ''ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিলে লোক জাতিভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু অখাদ্য ভক্ষণ করিলে লোক জাতিভ্রষ্ট হয়।''[৪] এই 'অখাদ্যে'র তালিকায় পড়ে—বরফ, বিস্কুট। কারণ এই আহার্যগুলি সাহেবদের হাতে তৈরি। কঙ্কাবতীতেই নয়—'ময়না কোথায়'-এর নরোত্তম মাশচটক কিংবা 'পাপের পরিণাম'-এর বেণীবাবুর স্ত্রীর খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে একটা ছুৎমার্গ রয়েছে। বেণীবাবু রামপাখির মাংস, বিলেতি বিস্কুট খেতেন বলে তার জপতপপরায়ণা স্ত্রী তাকে রীতিমতো ঘৃণা করত। আবার 'হঠাৎ ধার্মিক' হওয়া নরোত্তম মাশচটক নিজের পুত্রবধূকে তার বাবার বাড়িতে পাঠাতে চান না। কারণ হিসাবে তিনি দেখান ''যাদব বড় কদাচারী। তাহার পুত্রেরা সন্ধ্যাহ্নিক করে না, বিস্কুট খায়, বাজারের মাংস খায়।''[৫]

৩

উনিশ শতক ছিল প্রায় রাজনৈতিক অস্থিরতামুক্ত। আঠারো শতক কিংবা বিশ শতকের মত কোনো বড়ো রাজনৈতিক পালাবদল ভারতবর্ষের মানুষ দেখেনি। দেখেছিল কিছু জায়গায় কৃষক ও আদিবাসীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পট বদলে যেতে। আর এই পট পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। বড়োলাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তার আইনসচিব মেকলের শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাবটি (Indian in Blood and Colour. But English in tastes in opinions and in morals and intellect) মাথায় রেখেই ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ইংরেজি শিক্ষা সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করেন। ফলে ফারসি ভাষা হারাল রাজভাষার মর্যাদা। ইংরেজি হল নতুন ভারতের রাজভাষা। সরকারি চাকরি লাভের আশায় ফারসি ছেড়ে বাঙালি জোরকদমে ইংরেজি চর্চা শুরু করল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এদেশীয়দের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মত। রামমোহন রায় এর অনেক আগেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের দাবি জানিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে চিঠি লিখেছিলেন। শিক্ষার পালাবদলের ফলে জন্ম নিল চাকরিজীবি ইংরেজি জানা মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ছিল উনিশ শতকীয় বাংলায় নবচেতনার ধারক ও বাহক। তারা নিজেদের নতুন যুক্তিনির্ভর শিক্ষার আলোকে দেশীয় পুরানো ধ্যান-ধারণা, সংস্কারগুলির নবমূল্যায়ন করতে চাইলেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলার সমাজে তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়—প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী গতানুগতিক চিন্তাশীল রক্ষণশীল ধারা, মধ্যপন্থী ব্রাহ্মধারা ও শিক্ষিত যুক্তিবাদী প্রগতিশীল ধারা। স্বভাবতই পুরাতনপন্থীদের শাস্ত্র নির্দেশিত ভক্তিময় সমাজে যুক্তির অনুপ্রবেশ রীতিমত শোরগোল ফেলে দেয়। শিক্ষিত নব্যপন্থীরা চাইছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে পুরাতনপন্থীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠল। উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হল ঘোরতর বাকযুদ্ধ। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় পুরানো শাস্ত্র ভেঙে শাস্ত্রকে যুক্তি সহকারে জনহিতকারী করে তুললেন। বাংলায় এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হল। যার পরিচয় মেলে 'কঙ্কাবতী'তে—'কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইংরেজিও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পাড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন।''[৬]

উনিশ শতকের সমাজ দেখেছিল কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা। যা সেযুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারেননি। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের পর আবার একবার বাংলার সমাজজীবনে নতুন ভাবান্দোলনের সূচনা হল। এদেশের দীর্ঘদিনের সংস্কারের জগদ্দল পাথর নবীন যুক্তিবাদী শিক্ষার জোর ধাক্কায় নড়েচড়ে গেল।

১. সমাজ-সংস্কার বিষয়ক আন্দোলন ঃ—

ক) সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা রদ।

খ) বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন।
গ) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ।
ঘ) পণপ্রথা ও কন্যা বিক্রয় প্রথার বিলোপ।
ঙ) মদ্যপান নিবারণ।
চ) জাতিভেদ দূরীকরণ।
ছ) হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা।

২. ধর্মান্দোলন সংক্রান্ত ঃ—
ক) খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ।
খ) সনাতনী হিন্দু ও ব্রাহ্মদের পারস্পরিক মতবিনিময়।
গ) রক্ষণশীল হিন্দু ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী প্রগতিশীল হিন্দুদের মতবিরোধ।

লেখক ত্রৈলোক্যনাথ নিজের জীবৎকালে দেখেছিলেন উনিশ শতকের সমাজে রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার অনিবার্য স্নায়ুযুদ্ধ। দেখলেন উভয়ের সংঘাতের মাঝে ঝোপ বুঝে কোপ মারা একদল স্ববিরোধী মানুষদের সুবিধাভোগ ও দেশীয় ঐতিহ্যকে পায়ে ঠেলে পরানুকরণপ্রিয়তা। সুবিধাবাদীরা সময়ের তালে তাল মিলিয়ে কখনও প্রগতিবাদকে সমর্থন করেন। আবার সমাজে স্বার্থরক্ষার তাগিদে গোঁড়া-রক্ষণশীলদের দলে মিশে যেতে দ্বিধাবোধ করেন না। তারা যেন সমাজের এক একটা গিরগিটি। যে কোনো সময়ে নিজের রঙবদল করতে পারেন। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে এই ধরণের কিছু মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়।

সুবিধাবাদীদের সারিতে প্রথমেই আসে নায়িকা কঙ্কাবতীর পিতা রামতনু রায়, ওরফে তনু রায়। তনু রায় বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ। একজন ব্রাহ্মণের যথোচিত কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। বিশেষত কুলীন ও বংশজের যে রীতিগুলি। গ্রামীণ জীবনের সাথে শাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি শাস্ত্রমতে কর্তব্য-কর্ম সমাধা করেন বলেই সমাজের মানুষজনের কাছে তিনি বিশেষ ভক্তির পাত্র। তার মুখে শোনা যায়—"আজকালের ছেলেরা সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।"[৭] বেশি বয়সে কন্যাপণ দিয়ে তনু রায় বিবাহ করেন। তিন কন্যা ও এক পুত্রের পিতা। প্রথম দুই মেয়ের বিবাহ একটু বেশি বয়সেই দেন। তার বক্তব্য—"অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, কন্যা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে?"[৮] সুতরাং তিনি একজন প্রগতিশীল ব্যক্তির মতন বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করলেন। আবার বয়োবৃদ্ধ জামাতাদের মৃত্যুতে ও কন্যাদের বৈধব্যযন্ত্রণায় বিচলিত না হয়ে নিজের মনকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন—"যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।"[৯] তনু রায়ের গ্রাম কুসুমঘাটীতেও নতুন প্রগতিবার্তা পৌঁছে গেছে। গ্রামের নারী-পুরুষ সকলেই জানে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ (১৮৫৬ খ্রি.) প্রবর্তন করেছেন। তনু রায়ের স্ত্রী ঠাকুরকে সিন্নি চড়াতে চেয়েছেন যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়। তনু রায়ও বিজ্ঞ প্রগতিপন্থীদের মতো বিধবাবিবাহের পক্ষে সায় দেন। স্বাগত জানান বিধবাবিবাহকে—"বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন? শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুইবার কেন? বিধবাদিগের দশবার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।"[১০] 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাসে হীরালালের সঙ্গে কুসী ওরফে কুসুমের গোপনে বিবাহ হয়। কিন্তু আকস্মিক নৌকাডুবিতে হীরালালের মৃত্যুসংবাদে কাতর কুসুমের মাসি পুনরায় বিবাহ দেওয়ার কথা ভাবার সময় বিদ্যাসাগরের পক্ষ নেয়, "বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত, ধার্মিক, দয়াবান, পরোপকারী লোক ছিলেন। ইহাতে যদি পাপ থাকিত তাহা হইলে কখনই তিনি বিধান দিতেন না।"[১১]

একটা সময় দেশের দুর্দশায় চিন্তিত তনু রায়ের লোক দেখানো প্রগতিশীলতার মুখোশটি খসে গিয়ে তার সুবিধাবাদীর স্বরূপটি জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। নিজে একটা সময় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গাওনা গেলেও পরে বিপুল অর্থ, গহনাগাটি, ভূ-সম্পত্তির লোভে অল্পবয়সী কনিষ্ঠা কন্যা কঙ্কাবতীর বিবাহ দিতে চান বিপত্নীক বৃদ্ধ জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সাথে। এ

ব্যাপারে তার লোভী পুত্রই বেশি আগ্রহ দেখায়। তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মাকে কথা দিয়েছিল কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেতুর বিবাহ হবে। কিন্তু, সুবিধাভোগী পিতা-পুত্রের লাভালাভের গাণিতিক বুদ্ধির কাছে স্ত্রীলোকের দেওয়া কথার কোনো মর্যাদাই থাকল না। সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিয়ে আন্দোলন বেশ জোরালো হয়। মেয়েদের বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সেকালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাসে রসময়বাবু নিজের প্রথম পক্ষের মেয়ে কুসীকে বুড়ো দিগম্বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে পাঞ্জাবে আনেন। তার আগে নিজেও একটা বিবাহ করে ফেলেন। তা নিয়ে রসময়ের প্রতি যাদব ডাক্তারের বিদ্রূপের ধরণটি সত্যিই চমৎকার। ডাক্তার বলেন—"সগর্ভা সপুত্রা সকন্যা স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনিলেন না কি?"[১২] 'কঙ্কাবতী'তে জমিদার জনার্দন চৌধুরী যেমন কঙ্কাবতীকে, তেমনই ফোকলা দিগম্বরের ধনী বৃদ্ধ দিগম্বরও বাংলাদেশে পৌত্র-দৌহিত্রেরা থাকা সত্ত্বেও গোপনে যুবতী কুসীর সঙ্গে বিবাহ করতে উপস্থিত হন।

সুবিধাবাদীদের মধ্যে তনু রায়ের পরেই আসে ষাঁড়েশ্বরের নাম। সে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার একেবারে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর সুবিধাভোগের ধরণটা অন্যান্যদের থেকে একটু আলাদা। খেতুর বাবার সহায়তায় ওকালতি পড়তে কুসুমঘাটী গ্রাম থেকে সে কলকাতায় আসে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হবার পর ওকালতির রমরমা বাজার শুরু হয়। কাজেই কলকাতায় এসে ওকালতি পড়ো আর গাদাগাদা টাকা কামাও। তাই ওকালতি ছিল উনিশ শতকে সবচেয়ে লাভজনক পেশা। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করলেও তার মধ্যে যথার্থ সাহসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার বড্ড অভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পেশায় সে উকিল। কলকাতা শহরে নিজেকে নব্যবঙ্গীয় বলে পরিচয় দেন। কিন্তু, গ্রামে ষাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের একজন মাথা। তার দেশীয় ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে যাতে গ্রামের হিন্দু সমাজের মানুষজনের মনে কোনো রকমের সন্দেহ-সংশয় না থাকে সেজন্যে সে নিজের বাড়িতে প্রতিদিন হরিবাসরের আয়োজন করেন। আবার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বন্ধুমহলে নিজের তথাকথিত সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল ইমেজ বজায় রাখার জন্য বাড়ির অন্য ঘরে চলে উদোম মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ। " সে সময় সুরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।"[১৩]

৪

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নারী জাগরণ। সংগঠিত অধিকাংশ আন্দোলনই নারীকেন্দ্রিক। রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল, তা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলন ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষা প্রচলন অন্যমাত্রা পেল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। মিশনারিরা উদ্যোগ দেখায়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মিস কুকের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য ২৪ টি বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও পড়ুয়াদের সংখ্যা ছিল নেহাতই কম। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় 'নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' নামক সভার হাতে। এই বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত নিম্নবর্ণের মেয়েরা পড়াশোনা করতে আসল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদিয়া জেলাতে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ কিছু বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তবে মেয়ে-শিক্ষা রক্ষণশীলরা মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। তৎকালীন সময়কার নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকা সত্ত্বেও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান', মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যের বীরাঙ্গনাদের মাধ্যমে নারীপ্রগতির যে বার্তা দিয়েছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ সেই প্রগতিশীলতাকে উপন্যাসে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'কঙ্কাবতী'র নায়ক খেতু গ্রামে নারীদের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসে। সে কঙ্কাবতীর শিক্ষার ব্যবস্থা করে। তারই সাহচর্যে কঙ্কাবতী বর্ণপরিচয়, পাটীগণিত অঙ্ককষা, হরেক রকমের বই ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করতে শেখে। তনু রায়ও মেয়ের শিক্ষায় সায় দেন, স্ত্রীকে বলেন—' খেতু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, তাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।"[১৪]

'ফোকলা দিগম্বর'-এর নায়ক শিক্ষিত হীরালাল কৌলীন্য প্রথা, প্রভূত অর্থের প্রাপ্তির কথা ভেবেও বাড়ির অমতে একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের মতো মাতৃহীন অসহায় কুসুমকে বিবাহ করে। সহায়-সম্বলহীন তাদের পরিবারের পাশে থাকে। কুসুমদের গ্রামে রামপদ ও অন্যান্যরা মিলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। সেখানেই কুসুমের পড়াশোনা। শুধু কুসুমই নয়, তার মাসিও লেখাপড়া জানে। মাসির কাছ থেকেই কুসুম রামায়ণ, মহাভারত পড়তে শিখেছে। স্বামী হীরালালের মৃত্যুসংবাদের চিঠি কুসুম ও তার মাসি নিজেই পড়েছে। 'পাপের পরিণাম'-এ রাইচরণ রায় নিজের স্ত্রীর ভগিনীর মৃত্যু হলে ভগিনীকন্যা সুবালাকে নিজেদের কাছে রাখেন। তিনি ঠিক করেন—''কার্তিক মাসের পর যখন ইচ্ছা তখন সুবালার বিবাহ দিবে। এক্ষণে সুবালাকে ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।''[১৫] তাই সুবালাকে শিক্ষিত করতে একজন গুরুমাকে নিযুক্ত করেন। সেকালের অভিজাত পরিবারে অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

নারীশক্তির অবদমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল পুরুষসমাজ কখনোই চায় না যে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। নারীশিক্ষা সম্বন্ধে উনিশ শতকের সমাজ ভাবনা কেমন ছিল—তার আঁচ পাওয়া যায় সেই সময়কার অনেক লেখা পত্র থেকে। স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

> প্র। ভালো, যদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয়্যা মানুষ কেন শিখে নাই?
>
> উ। শুন লো, যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর-কন্না কেমন করিয়া চালাইবি।[১৬]

নারীশিক্ষা নিয়ে এও রটনা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ছেলে হয়ে যাবে, বিধবা হবে ইত্যাদি। প্রগতিশীল মানুষদের সহায়তায় নিজেদের ভাগ্যকে জয় করার স্বপ্ন তারা দেখেছিল। রক্ষণশীলতার কাঁটায় তাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নায়িকা কঙ্কাবতী থেকে কুসুম, প্রভাবতী, সুবালা কমবেশি সকলকেই তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানারকম গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কঙ্কাবতীর পিতা তনু রায় কিংবা কুসুমের পিতা রসময় কেউই নিজের মেয়ের প্রতি সুবিচার করেননি। পয়সাওয়ালা বৃদ্ধের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে কন্যাদায় সারতে চেয়েছেন। তারা প্রগতির চিন্তাই করেননি। সুযোগসন্ধানী পিতা অর্থের লালসায় বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীর সাথে স্বল্পবয়সী কন্যা কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করেন। আর রসময় তো একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলেন তার মা-হারা একটা মেয়ে আছে। প্রভাবতীকে শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির হাতে পীড়িত হতে হয়েছে—''জলে গোবর গুলিয়া দিনের মধ্যে পাঁচ-ছয়বার তিনি নিজের ও পুত্রবধূর মাথায় ঢালিতেন। .... তাহার উপর গালাগালি।''[১৭] শুধু এদের মতো ভারতীয় নারীই নয়, রাজার দেশ ইংল্যাণ্ডের নারীরাও পুরুষদের বৈষম্যের শিকার হয়েছে। উচ্চশিক্ষা থেকে তারাও বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্বের দুই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডে নারীরা প্রবেশাধিকার পেল যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। রাজার দেশ হোক আর প্রজার দেশ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রূপটি একই রকমের। আসলে, 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পদতলে নারীর ঐকান্তিক আনুগত্যই সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতি টিকিয়ে রাখার একমাত্র ভরসা বলে পরিগণিত হয়েছিল তাদের কাছে।''[১৮]

৫

উনিশ শতকের অনেক আগেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নামেন। তাই বাঙালি হিন্দুসমাজে খ্রিস্টান পাদরিদের অভিযান এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে তাদের এই ধর্মান্তকরণের পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। যখন পাদরিরা দেখলেন ব্রাহ্মসমাজ শুধু সমাজই নয়—বিশেষ করে হিন্দুসমাজের বড়ো সংস্থা হয়ে উঠছে, তখন তারা রীতিমত অস্থির হয়ে উঠল। ফলে দীক্ষিতকরণে তাদের ছল-চাতুরীর মাত্রাও বেড়ে গেল। শুধু নিজেরাই নন, তাদের পোষা এদেশীয় সাঙ্গোপাঙ্গদেরও এ কাজে লাগিয়ে দেন। পাদরিদের ক্যাথলিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার ছাড়াও হিন্দুধর্ম নিয়ে নানা রকম নিন্দাসূচক মন্তব্য করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচনা দিতে থাকে।

'কঙ্কাবতী'তে পাদরি সাহেবের সাথে ষাঁড়েশ্বরের নিত্য ওঠা-বসা। সে খেতুকে ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছিল। তবে তা পারেনি। আবার পাদরি সাহেব খেতুকেই নয় সমগ্র বাঙালি জাতিকে মিথ্যাবাদী, বদমায়েশ, জালিয়াত বলে অপমান করলেও ষাঁড়েশ্বর চুপ থাকে। খেতুকে নিষিদ্ধ আহার্য খাওয়াতে চেয়েও সে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, গ্রামের লোকজনের কাছে খেতুকেই মদ্যপ প্রতিপন্ন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। ষাঁড়েশ্বর গ্রাম-শহর উভয় সমাজের মানুষের কাছে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে ও যাবতীয় সুবিধাভোগ করতে যথেষ্ট তৎপর।

৬

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর থেকেই সতেরো ও আঠারো শতকের মধ্যে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ভারতসহ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের জনগণও দুটি জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল। এক—সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণি ও দুই—ওই ভূখণ্ডে বসবাসকারী শোষিত শ্রেণি। শাসকশ্রেণি জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের অধীনস্থ উপনিবেশের বাসিন্দাদের হীনজাতিভুক্ত মনে করত। নিজেদেরকে তারা তুলে ধরেন উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের স্বঘোষিত অভিভাবক হিসাবে। ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' তত্ত্বকে সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগ্যতম জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব তারা খাড়া করল। তাদের বদ্ধমূল ধারণাই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ জাতির তুলনায় তারা উন্নত। এশিয়া-আফ্রিকার মানুষ তাদের সমকক্ষই নয়। আর এই 'উন্নত রূপ'টি প্রকাশিত হয় সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে। অনুন্নত কালো চামড়ার মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার দায় তাদেরই। ফরাসি লেখক জুলি ফেরি থেকে শুরু করে 'জাঙ্গলবুক' খ্যাত ইংরেজ লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং উন্নতির দায়িত্বের কথা বলেছেন। হিতবাদের অন্যতম প্রবক্তা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস্ মিল বলেন, ব্রিটিশ শাসন অনুন্নত ভারতীয়দের পক্ষে মঙ্গলকর। কখনও মেকলেকে বলতে শোনা যায়, ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থাগারের একটি তাক সমগ্র ভারত ও আরবের সাহিত্যের সমান। কাজেই শাসক-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এদেশীয় মানুষদের দেশীয় কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয় যে সাহেবদের সবকিছুই উন্নত ও ভালো। তারাই আমাদের পরিত্রাতা।

সাহেবদের নকল করলেই পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যাবে। এদেশীয় মানুষদের লাগামহীন সাহেবিয়ানার অনুকরণ শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষে। যা গোটা উনিশ শতক ধরে পুরোদস্তুর চলতে থাকে। অনুকরণ অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, ইংরেজি বুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বড়োলোক বাবুদের বসতবাড়ি থেকে আসবাবপত্র, যানবাহনেও দেখা গেল। তাছাড়া, ''উন্নত প্রজাতির মানুষ ইংরেজদের উচ্চারণের সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেদের নাম, পদবি, স্থানের নাম বিকৃত করে ওদের সান্নিধ্য এবং বশংবদতা অর্জন করা হয়েছে।''[১৯] তাইতো এদের কাছে ঠাকুর হল টেগোর, বসু হয় বোস, হরি হয় হ্যারি কিংবা শহর কৃষ্ণনগর হয়ে যায় কৃষনগর।

উনিশ শতকীয় সমাজবাস্তবতার এই বাঙালির অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের দিকটি ত্রৈলোক্যনাথ প্রতীকী ইঙ্গিতে কঙ্কাবতীতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যাঙ সাহেব ওরফে মিষ্টার গামিশ এই পাশ্চাত্য ঘেঁষাদের দলভুক্ত। ব্যাঙের হাবভাব, চালচলনে তা স্পষ্ট—''মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলেন, ব্যাঙ, সাহেবের পোষাক পরিয়াছেন, ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রঙটি কেবল ব্যাঙের মত আছে, সাবান মাখিয়াও রঙটি সাহেবের মত হয় নাই।''[২০] আরও লক্ষণীয় যে ব্যাঙ নিজের পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে স্বনির্বাচিত মিষ্টার গামিশ নামে নিজেকে সবার সঙ্গে পরিচয় করাতে ব্যস্ত। তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের বহর দেখে আমাদের বুঝতে দেরি হয় না সে কতটা অন্তঃসারশূন্য। ব্যাঙ সাহেব যে ইংরেজি বলছে তা ইংরেজি কেন কোনো ভাষাই নয়। তবু সে পণ করেছে কোনোমতেই মাতৃভাষা বাংলা বলবে না। ভুলভাল বকতে সদাতৎপর। ''কারণ লোকে যদি শুনে যে তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে ' নেটিভ' মনে করিবে।''[২১] সাদা চামড়ার সাহেবদের কাছে কালা আদমি মাত্রই নেটিভ।

তবে ইংরেজিয়ানার প্রভাব শুধুমাত্র প্রাণীজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভূতেদের সাম্রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ইংরেজিজানা কোটবুট পরিহিত বাবুদের ভূতের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভূতেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই ভূতদের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের জন্য ভূতেরা স্কাল স্কেলিটন এণ্ড কোং নামে এক কোম্পানি খুলেছে। তাদের বিশ্বাস এতে তাদের পসার নাম প্রতিপত্তির সঙ্গে লোকের মনে ভূত সম্পর্কে বিশ্বাসও বাড়বে। দেশীয় নাম রাখলে তা বাড়ার সম্ভাবনা তো থাকবেই না। বরং এদেশীয় লোকজন তাদেরকে নিয়ে খিল্লি করবে—বলবে এরা পাকা জুয়াচোর। সাহেবরা এদেশের সংস্কৃতিকে ভালো বললেই ভালো। 'কঙ্কাবতী'তে ভূতের মুখ দিয়ে এই ঔপনিবেশিক সত্যটি বেরিয়ে এসেছে—'' বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণই ভাল হয়। দেশি পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়াছি—স্কাল স্কেলিটন এণ্ড কোং।''[২২]

৭

কেরানি তৈরির শিক্ষাকলের আড়ালে ঔপনিবেশিক প্রভুদের শোষণের চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। সওদা করতে এসে শাসক হয়ে ওঠার ইতিহাস-বৃত্তান্ত কমবেশি প্রায় সকলেরই জানা। কৃষিজ ফসল, খনিজ সম্পদ থেকে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার পুঁথি সবই নিজেদের দেশে চালান করে অর্থ-সমৃদ্ধির পাহাড় গড়েছে। 'মশাপ্রভু' অধ্যায়ে দীর্ঘ বক্তৃতায় এই শোষণের ব্যাপারটি বেশ ভালোই বোঝা যায়—''ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া এতদিন আমাদিগকে সেবা করিতেছিল, বিনীতভাবে শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল।''[২৩]

কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নব্য জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয় তা মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কাল পর্যন্তও স্থায়ী ছিল। নতুন জমিদারদের অনেকেরই নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ছিল না—মোসাহেব দ্বারা পরিচালিত হতেন। কঙ্কাবতী উপন্যাসের বৃদ্ধ জমিদার জনার্দন চৌধুরী তাদেরই জাতভাই। অন্যকে পীড়ন করে তার সীমাহীন আনন্দ। নিরঞ্জনের মত সজ্জন মানুষের ব্রহ্মোত্তর জমি হাতিয়ে নেওয়া, প্রমাণ-স্বরূপ দলিলখানি পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনায় যেমন তার অত্যাচারী রূপটি প্রকাশ পায়, তেমন বরফ খেয়ে খেতুর সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে খেতুকে একঘরে করে দেয়। কেবলমাত্র খেতু, নিরঞ্জনেরাই নয় নায়িকা কঙ্কাবতীও তার শিকারের জালে পড়তে গেছে।

৮

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালি কেন, সারা ভারতবর্ষকেই নতুন করে ভাবিয়েছিল। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের ষোলকলা পূর্ণ হয়। তাদের শিক্ষাদীক্ষা সহ অন্যান্য কার্যকলাপের পিছনে হয়তো কায়েমি স্বার্থ ছিল। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে জাতীয়তাবাদের বীজ উনিশ শতকের জলহাওয়াতেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। প্রগতি বনাম রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বাস্তবময় দিকগুলি ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উপন্যাসে যেভাবে দেখিয়েছেন তা সত্যিই আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। তিনি বরাবরই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। কোথাও যেন তিনি সমন্বয়ের কথাই উপন্যাসে বলে গেলেন। যে ভাবনাগুলি এই চলমান একুশ শতকেও প্রাসঙ্গিক।

সূত্রনির্দেশ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, কঙ্কাবতী বাস্তব ও স্বপ্নের নকশি কাঁথা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৯২।
২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৯৫।
৩. দিলীপ কুমার মিত্র সম্পাদিত, ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৫৮২।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮৩।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮৪।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৬।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৬।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৭।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৭।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩৪।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৫৬।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১৮।
১৩. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৯।
১৪. দিলীপ কুমার মিত্র সম্পাদিত, ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৩৭।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১৮।
১৬. স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, স্বপন বসু সম্পাদিত উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪২৫, পৃষ্ঠা ৬৮।
১৭. দিলীপ কুমার মিত্র সম্পাদিত, ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৫৭৪।
১৮. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ; জানুয়ারী ২০১৩, পৃষ্ঠা ২২২।
১৯. অরবিন্দ পোদ্দার, শস্যের ভিতরে রৌদ্র : অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজ, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৪।
২০. দিলীপ কুমার মিত্র সম্পাদিত, ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র, সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৭৮।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৮।
২২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭৩।
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

সুনির্মল বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড।

ক্ষীরোদপ্রসাদের উলূপী : মিথ-পুরাণের প্রয়োগ ও পর্যালোচনা

তুষার পটুয়া

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) বাংলা নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার জন্য। আমরা জানি যে প্রায় সবদেশেই ধর্মমূলক জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান থেকেই নাটকের উৎপত্তি হয়ে ক্রমশ উন্নীত হয়েছে সর্বদেশীয় ও সর্বজনিক সাহিত্যে। তবে কোন নাটকই আর ধর্মের একটা সংকীর্ণ বন্ধনীর মধ্যে বেশি দিন তো আর আবদ্ধ থাকেনি। মধুসূদন রামনারায়ণ দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখজনের হাত ধরে বাংলা নাটকের বৈচিত্র্য আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হল। উপকরণ বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক দিয়ে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হল। বিশেষ করে বাংলা নাট্যজগতে যখন গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারদের যুগ তখন সেই যুগে যে দু'চারজন নাট্যকার দেখা দিয়েছিলেন যাঁরা নিজের প্রতিভাবলে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাট্য-প্রতিভাই সমধিক সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। কাব্য-কবিতা রচনা করলেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি বেশি। তিনি সাফল্য পেয়েছেন বেশি নাট্যকার হিসেবেই—একথা বলাই বাহুল্য। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, গীতিনাট্য সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটির মতো নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সাবিত্রী', 'বভ্রুবাহন', 'উলূপী', 'ভীষ্ম' নরনারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকের ধারাটি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে 'উলূপী' নাটকটি বাংলার নাট্যজগতে অধিক সমাদর লাভ করেছিল একসময়। গিরিশচন্দ্রের কাল থেকে পৌরাণিক নাটকের যে গতানুগতিক কাহিনির ধারা প্রবহমান ছিল সেখানে মিথ ও পুরাণ অনাবশ্যক ভার হয়ে উঠেছিল নাটকের অন্তর্বয়নে। নাটকের না বলে কাহিনির অন্তর্বয়ন বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা, দেবচরিত্র ও তাঁদের উপযুক্ত সংলাপ এমনকি উপযুক্ত উপমা রূপকের ব্যবহার পর্যন্ত ছিল সীমাবদ্ধ। পৌরাণিক নাটক মানে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অলৌকিক বা অতিলৌকিক মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলূপী' এই ধারার একটি ব্যতিক্রমী নাটক। তিনি শুধু পৌরাণিক দৃষ্টি দিয়ে না দেখে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই এই নাটকের ও এখানে প্রযুক্ত মিথ ও পুরাণের বিশেষভাবে চর্চা প্রয়োজন। তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্য, বৌদ্ধজাতকের গল্প, প্রাচীন রূপকথা এমনকি রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে নতুন ধারায় কাহিনির গতিমুখ পরিবর্তিত করে নাট্যসাহিত্যকে নতুনপথে প্রবাহিত করেছেন। উলূপী নাটকের কাহিনি মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও নাটকে নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাট্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের প্রচলিত পৌরাণিক ধারার ভাবনাগত কৌলিন্য বা সীমাবদ্ধ রূপরেখা দূর করেছেন নাট্যকার।

মহাভারতে অর্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বীর ক্ষত্রিয়। বিশ শতকের শুরুতে যখন বাঙালি ভাবনা সংলিপ্ত ছিল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় সেই সময় অনেক নাট্যকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে গিয়ে অনুবাদ ও মৌলিক নাটকের মাধ্যমে নতুন নতুন নাটক রচনা করে চলেছিলেন। সাধারণের চিন্তনেই প্রোথিত ছিল অলৌকিক জগতের বিচিত্র কথার সম্ভার। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে মন্মথমোহন বসু 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (পৃ. ১৬৮) গ্রন্থে বলেছিলেন, 'এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মগত ছিল। তিনি এক তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বপুরুষের অলৌকিক শক্তি-সম্বন্ধে নানা গল্প শুনা যায়।' অর্থাৎ নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি মিশে ছিল।

পটুয়া, তুষার : ক্ষীরোদপ্রসাদের উলূপী : মিথ-পুরাণের প্রয়োগ ও পর্যালোচনা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 13-17, ISSN 2249-4332

২

বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এ 'পুরাণ' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'পুরাভব', 'পুরাতন', 'চিরন্তন', 'আদিম' প্রভৃতি। সংস্কৃতে কোথাও কোথাও 'কথা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'পুরাণ' শব্দটি। পুরাণকে আবার 'বেদসম্মিতম্'ও বলা হয়েছে; অর্থাৎ বেদের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে কোন বিরোধ নেই। পুরাণ সর্বত্র ধর্মশাস্ত্রানুগামী। হিন্দু শাস্ত্রে সমস্ত প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ব্যাপারের জন্যে এক এক দেবতার ভাবনা প্রচলিত। আর মিথ সাধারণত ইতিহাস ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মিথের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে অবাস্তব অতিকথা, ইংরেজিতে false nation এবং spiritually allegorical। মিথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ফুটিয়ে তোলে, তবে কোনো কোনো সময় নতুন কিছু ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে থাকে। বৈদিক সাহিত্য মহাকাব্য বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ হল মিথ ও প্রচলিত কথার উৎসস্থল ও গচ্ছিত রাখার মূল কেন্দ্র। সেখানে মিথ সমগ্র মানব জীবন তথা সমাজের একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয়। 'A Glossary of Literary Terms' বইতে M. H. Abrams বলেছেন—

> In classical greak, "mythos"[১] signified any story or plot, whether true or invented. In its central modern significance, however, a myth is one story in a mythology–a system of hereditary stories of ancient origin which were once belived to be true by a particular cultural group, and which served to explain (in terms of the intentions and actions of deities and other supernatural beings) why the world is as it is and things happen as they do, to provide a rationale for social customs and observances, to establish the sanctions for the rules by which people conduct their lives. Most myths are related to social rituals–set forms and procedures in sacred ceremonies.....

বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাশ্চাত্য অনুসরণ লক্ষ্য করা গেলেও প্রাচ্যের অনুকরণ জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। ধর্ম, পুরাণ-মিথের সূত্র ধরে এই ধারার নাট্য-ধারা গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের মাঝপথ থেকে বাংলায় পৌরাণিক নাটক লেখার চল শুরু হয়। ১৮৫২ সালে রচিত তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকই মনে হয় বাংলা ভাষার প্রথম পৌরাণিক নাটক। পরে গিরিশচন্দ্র এই ধারায় একজন প্রতিষ্ঠিত নাম। ইংলণ্ডে যেখানে ধর্ম প্রচারের সহায়করূপে নাটকের জন্ম সেখানে পৌরাণিক নাটকের গুরুত্ব কম। কিন্তু বাংলাদেশে এই পুরাণ ও মিথের প্রভাব এবং তার দ্বারা নাট্যধারা পরিপুষ্ট হওয়ার গৌরব খাটো করে দেখলে ভুল হবে।

৩

উনিশ শতকের শেষ দশকের মধ্যভাগ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকার জীবন শুরু হলেও বিশ শতকের শুরুর দিকেই তিনি স্বকীয় ধারার নাট্যরচনার দ্বারা আমাদের অভিভূত করেছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগ রক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতা দ্বারা তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন।'[২]

পৌরাণিক নাটকের মূল সুর হচ্ছে ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের শিথিল পথ দিয়ে প্রবেশ করে জনসাধারণের মধ্যে জমে থাকা প্রচলিত ধারণাগুলি। তবে বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে নেওয়া হলেই নাটক পৌরাণিক হয়ে যায় না, যেমন মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা', রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলেও নাটকগুলি পৌরাণিক নয়; বরং বলা যায় পুরাণ-আশ্রিত। এক্ষেত্রে 'উলূপী' নাটক পৌরাণিক

হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি কথার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় 'ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা ঐতিহাসিক নাটক হয়, সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা তাহা সামাজিক নাটক হয়, কিন্তু পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলেই তাহা পৌরাণিক নাঠক হয় না। তারপর পুরাণের সংজ্ঞাটিও বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে খুব স্পষ্ট নহে, তাঁহাদের মতে রামায়ণ-মহাভারতও যেমন পুরাণ; বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তেমনই পুরাণ। কিন্তু তাঁহারা গভীরভাবে কখনও ভাবিয়া দেখেন না যে রামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত ইতিহাস—ইহারা পুরাণ নহে।'[৩] মহাভারতের আখ্যায়িকা বা উপদেশ, এমনকি উক্তি সম্বন্ধে জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় মূল। মহাভারতই ধর্ম, এই মহাভারত জিজ্ঞাসার অতীত-আজন্ম এই ধারণাই চিরকাল বাঙালির মনে প্রাণে মেনে চলে।

হিন্দু সভ্যতার উৎসভূমি বেদ। আর হিন্দুমতে বেদ অনাদি, অনন্ত জনসাধারণের মনের বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই রামায়ণ মহাভারত দুই-ই বৈদিক আলোকে উদ্ভাসিত। এই মহাকাব্যদ্বয় বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্বাসে গড়া মিথের মিশ্রণ বিধৃত হয়েছে। তাই শিল্পীদের কাছে কখনও রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অর্জুন, ভীম প্রমুখ চরিত্র তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় অনেক শিক্ষা, নীতি, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত নানান কথা কখনও ঘটনা কখনও চরিত্রকে কেন্দ্র করে মিথের মাধ্যমে আমাদের কাছে জীবন্ত রূপ ধারণ করে চলমানতা বজায় রাখে। অনেক শিক্ষা আমরা সেই প্রচলিত কথার থেকে জেনে যেতে পারি। এখানেই মিথের গুরুত্ব নির্ভর করে। মহাভারতে একটি রাজপরিবারের রাজ্যাধিকারজনিত কলহ মূর্ত হয়ে উঠলেও পশ্চাতে প্রধান-অপ্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে নীতিশিক্ষার পাঠ পেয়ে যাই সহজেই। তাই এই দুই মহাকাব্যদ্বয় পাঠ না করেও যে-কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিপাদ্য কথাগুলি প্রচলিত নানান মিথের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

৪

মহাভারতে আছে, একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে দুরবস্থার কথা জানালে তাতে বিচলিত হয়ে অর্জুন প্রতিকার করার জন্যে অস্ত্র আনতে গেলে শর্তভঙ্গ হয়। শর্ত ছিল দ্রৌপদীর সঙ্গে কোনও ভ্রাতা এক ঘরে বাস করার সময় কোনও ভ্রাতা মোহবশত যদি ঘরে প্রবেশ করেন, তাহলে তিনি বারো বছর পর্যন্ত বনে থেকে ব্রহ্মচর্য করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বনে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কিন্তু নিয়মের বিধির বিধানে দ্বাদশ বর্ষকাল বনভ্রমণে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়ে নানা দেশ প্রদক্ষিণ করার সময়ে অর্জুন নাগরাজকন্যা উলূপী, মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং যাদবদুহিতা শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। যাত্রাপথে নানান তীর্থস্থান অতিক্রম করে যখন গঙ্গাদ্বারে গিয়ে আশ্রম নির্মাণ করলেন তখন একদিন স্নান ও পিতৃতর্পণ সমাপান্তে উলূপীর হাতে পড়লেন। অর্জুনকে কামার্ত উলূপী টেনে নিয়ে গিয়ে 'কৌরব্য' নামক নাগের ভবনে উপস্থিত করে। আসলে এই উলূপী হল ঐরাবত বংশসম্ভূত 'কৌরব্য' নাগের কন্যা। দীর্ঘ কথোপকথনের পর শাস্ত্রমতে অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেন। উলূপী অর্জুনকে বর দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে। মহাভারতের এই অংশ থেকে কাহিনি গ্রহণ করে উলূপী নাটক লেখা হল।

নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করলে বোঝার সুবিধা হবে যে, কীভাবে নাট্যকার এই বিষয়টিকে নতুনভাবে ও নতুন আঙ্গিকে রূপ দান করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে একদিন নারদ নাগরাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন 'ভক্ত খুঁজতে আমি ভারতের প্রান্তে, এই অনার্য্য জাতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত নাগভূমে এসে উপস্থিত হয়েছি।' নাগরাজকন্যা পতিপরায়ণা উলূপীর পাতিব্রত্যধর্ম পরীক্ষা করবার জন্যে তাকে একটি অপূর্ব সঞ্জীবনী মণি উপহার দেন। যে মণি শুধু একবার মাত্র জীবন সঞ্চার করেই প্রভাহীন হয়ে যাবে। মণি প্রদানের পর নারদের উক্তি 'মণি দিলেম না, অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেম। এই জটিল সমস্যাময় সংসারে দেখবো মা কেমন করে তুই পাতিব্রত্য রক্ষা করিস! নারায়ণ প্রেরিত হয়ে নাগকন্যাকে দেখতে এসেছি, মণি দিয়ে মণির পরীক্ষা।' ফলে শুরুতেই নাট্যকারের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। আমরাও জেনে

গেলাম এই উপাখ্যানের প্রকৃত গন্তব্য কোথায়! নাটকে নাট্যকারের অনেক স্বাধীনতা থাকে মূল বিষয়কে ভেঙে গড়বার বা বিনির্মাণের। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। নাট্যমুহূর্ত ঘনিয়ে উঠেছে এই মণিকে কেন্দ্র করেই। আর এই থেকে বাঙালি হৃদয়ে স্বামীর জন্যে স্থান কতটুকু থাকে বা থাকা উচিত সেই নীতিকথারও ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে।

উলূপী-অর্জুনের একমাত্র সন্তান ইলাবন্ত। একদিন গণকের ছদ্মবেশে নারদ উলূপীকে জানায় যে, সেই তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হবে। এই কথা শুনে উলূপী জাহ্নবীজলে আত্মবিসর্জন করতে যায়। ইতিমধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করেছে শুনে ভীষ্ম-জননী জাহ্নবী অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন যে, অর্জুন এই পাপের ফলে 'রৌরব' নামক নরকে পতিত হবে। কিন্তু উলূপী এই কথা শুনে জাহ্নবীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানালে তিনি সদয় হয়ে এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় বলে দিলেন। তিনি বলেন যে, অর্জুন একমাত্র পুত্রের হাতে নিহত হলেই এই নরক থেকে মুক্তি পাবে। ''রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্রহস্তে যদি কখন অর্জ্জুনের বিনাশ হয় তবেই তা'র মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় আর নাই।'' অর্জুন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষী হয়ে মণিপুর রাজ্যের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সেই সময় উলূপী পুত্র ইলাবন্তকে পিতৃবধে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ইলাবন্তও পিতৃভক্ত; তাই এই কর্মে মায়ের সঙ্গ দিতে পারে না। উলূপী শেষপর্যন্ত মণিপুর রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার কাছে উপস্থিত হয়। এই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের অন্যতম একজন পত্নী এবং তার পুত্রের নাম বভ্রুবাহন। পিতৃপরিত্যক্ত বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুন পরাজিত ও নিহত হন। সেই সঙ্গে পিতাকে রক্ষার্থে উলূপী-সন্তান ইলাবন্তও নিহত হয়। 'ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করবার জন্য পুত্রত্বে জলাঞ্জলি দেয়।' বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের কথোপকথন কালে অর্জুন পুত্রকে এই কথা বলেন এবং উপদেশ দেন বীর কখনও পিতা-পুত্র দেখে না। বীর লড়াই করে জয়লাভ করে। অর্জুনের এই শিক্ষা বাংলাদেশের সমাজে নীতিশিক্ষার দায়ভার গ্রহণ করেছিল। মিথের কাজ হয়তো তাই-ই। জনগণের মৌখিক শাস্ত্রের উপর বেঁচে থেকে এই মিথের গল্পগুলি। জনগণকেই অবহিত ও সজাগ করার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। মূল মহাভারত থেকে জানা যায় যে, অর্জুনের তৃতীয় মৃত্যু ঘটেছিল তাঁরই পুত্র চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত বভ্রুবাহনের হাতে (অশ্বমেধ পর্বে)। মহাভারতে অর্জুনকে দেখা হয়েছে পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষ থেকে। তাই তাঁর ত্রুটি কম দেখানো হয়েছে, বেশি করে আছে শৌর্য্য ও পরাক্রমশীলতার। কিন্তু নাট্যকার অর্জুনের ভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন, সে স্বাধীনতা অবশ্য একজন শিল্পীর থাকে। এইরকম বীর স্বামী অর্জুনের প্রাণ উদ্ধারে উলূপী একদণ্ড বিচলিত হয়নি। এই নাটক প্রসঙ্গে 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, ''ঐতিহাসিক নাট্যরচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যে স্তরের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁহার এই বিশেষ (উলূপী) পৌরাণিক নাটকটির মধ্যেও সেই একই স্তরের প্রতিভা-বিকাশের ক্ষেত্র ছিল; সেইজন্য ইহা পৌরাণিক নাটক হইয়াও ঐতিহাসিক রচনারই লক্ষণাক্রান্ত।'' পৌরাণিক নাটকের সূত্রগুলিকে বজায় রেখে আদর্শ পাতিব্রত্য, মাতৃপিতৃভক্তি, ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি উলূপী চরিত্র স্থাপন করে নাট্যকার ভারতীয় পাতিব্রত্যের এক অভিনব পথ রচনা করেছিলেন।

কথাশেষ

পুরাণ পঞ্চলক্ষণযুক্ত। অর্থাৎ সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, বংশ বা বংশপরম্পরা, মন্বন্তর বা কালনির্দেশক সংকেত এবং বংশানুচরিত বা বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির বিবরণ। আদিতে পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণই ছিল এবং এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ হল History। আধুনিককালে ইতিহাসে যেমন ভৌগোলিক বিবরণ, আচার-ব্যবহার ও ধর্মের মূলকথা ও বিস্তারে কথিত হয়; অতীতে পুরাণেও এই সকল বিবরণ ক্রমে স্থানলাভ করেছিল। নাট্যকারদের মধ্যে অতীতের কথা বলবার প্রেরণা থেকেই এই পুরাণপ্রীতি, এই মিথভাবনা। এই পুরাণের সঙ্গে নানা বিষয় যোজিত হয়ে সৃষ্টি হয় মহাপুরাণের।[৪] ক্ষীরোদপ্রসাদ এই ধারার একজন নাট্যকার। তিনিও বাংলা তথা বাঙালির ধর্মভাবনার মূল খুঁজতে গিয়ে যে শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন সেখানে রামায়ণ-মহাভারত ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলির চর্চা সমধিক মর্যাদা পেয়েছে। 'যেখানে ধর্ম্মের স্থিতি, জয় সেইখানে' ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়ে ধর্মপথে গমনকারীর পরিণতি কেমন হতে পারে তার কথা শুধু এই নাটকেই নয়;

'প্রতাপ-আদিত্য', 'রঘুবীর' নাটকেই নয়, 'রঞ্জাবতী', 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি নাটকেও নাট্যকার দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ন্যায় আমরা পরবর্তীকালে দেখবো যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আমাদের মিথ-পুরাণগুলিও এই পৃথিবীকে ও ইহজগতে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়কে বাদ দিয়ে চিন্তা করেনি, বরং তুলনায় অধিক প্রাণবন্ত ও সক্রিয়ভাবে বাঁচতে সাহায্য করেছে। নাট্যকারদের মধ্যে পুরাণচর্চার তাই এত আতিশয্য।

টীকা ও সূত্র-নির্দেশ

১. গ্রীকদের অভিধানে মিথোস শব্দের অর্থ মুখে মুখে প্রচারিত কাহিনি বোঝায়।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২০০৩, পৃ. ২৩৫।

৩. বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক নামে একটি গ্রন্থের ভূমিকায় আশুতোষ ভট্টাচার্য এই কথা বলেছেন। এমনকি 'মহাভারত চিন্তা' (নবপত্র প্রকাশন, ১৩৭২, ১লা বৈশাখ) গ্রন্থে রাজ্যেশ্বর মিত্রও বলেছেন, ''মহাভারত ইতিহাস এবং গল্পের সংমিশ্রণ। মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু যে ঐতিহাসিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ....।'' 'মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ' (ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ) বইতে অবসরপ্রাপ্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত শিশির কুমার সেন বলেছেন, ''সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের প্রাচীন শ্রেণী বিভাগ মতে মহাভাতর ও রামায়ণ 'ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ এইভাবে দিয়েছেন, ''ধর্মার্থকামমোক্ষমণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে।'' অর্থাৎ শাস্ত্রকারদের মতে ইতিহাস শুধু পূর্ববৃত্তকথা নয়, তাতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির উপায় নির্দিষ্ট থাকবে। মহাভারত রামায়ণে বিশেষতঃ মহাভারতে, পূর্ববৃত্ত কথার সঙ্গে বহু উপদেশ গ্রথিত হয়েছে বোধহয় 'ইতিহাসের' এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।'' এই ইতিহাস বর্তমান কালের নয়, মহাভারতে রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতির ইতিহাস ও বিবিধ ধর্মের ব্যাখ্যা আছে।

৪. ভাগবতপুরাণে ৭ম অধ্যায়ে মহাপুরাণের যে লক্ষণ কথিত আছে, তা হল—

''সর্গোহস্যাথ বিসর্গশ্চ ব্রত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ।।''—অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু এবং অপাশ্রয়।

তুষার পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া

আসামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

নয়ন সরকার ও তপনকুমার বিশ্বাস

বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কালের। গবেষকদের অনুমান প্রায় তিন হাজার বছর আগে মেয়েরাই প্রথম প্রকৃতি থেকে উপকরণ ও কাঁচামাল ইত্যাদি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। যা দিয়ে সুতো ও বস্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে। বয়ন কৌশলের প্রাথমিক পর্যায়ও মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল। আজ পর্যন্ত আমাদের পরিধেয় প্রধান বস্ত্র তৈরিতে যে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহৃত হয় তার প্রত্যেকটি এক একটি সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে শন জাতীয় তন্তু, চিন সভ্যতার সঙ্গে রেশম জাতীয় তন্তু, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সঙ্গে উল জাতীয় তন্তু, ভারতীয় ও পেরু সভ্যতার সঙ্গে তুলা জাতীয় তন্তু উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২০০ বছর আগে রোমবাসীরা 'কার্বসিনা' নামে বস্ত্র ব্যবহার করত যা সংস্কৃতের 'কার্পাস'। ভারত থেকে সম্রাট নীরোর সময়ে ভারতীয় মসলিনও যেত। নাম Nabula Venil অর্থাৎ কুয়াশা, ধোঁয়া বা মেঘ।

প্রাচীনকালে বঙ্গে পুণ্ড্রে চার প্রকার বস্ত্র উৎপাদিত হত—দুকূল, পত্রোর্ন, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। কার্পাসের সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য সম্ভার। অসমের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র অবশ্য সমকালে ছিল শোয়ালকুচি। তবে বিভিন্ন জেলাতেও নানা শ্রেণির বস্ত্র উৎপাদিত হতো। শুধু তাই নয় ইরাক, ইয়েমেন, আরব, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, মালয়েশিয়ার জন্য খাসা, বাফতা, সানিজ, মলমল, তাজীব, কেঞ্চি প্রভৃতি জাতের উন্নত বস্ত্র তৈরি হতো।

শোনা যায় শোয়ালকুচির সূচী শিল্প তসর ও মুগার চাদর ও ইউরোপীয়দের খাটের উপযুক্ত করে তৈরি হতো। এগুলিতে Running Stich কিম্বা Back Stich এর কাজে ব্যবহৃত হতো।

আসামের পোশাকের পরিচয় নেওয়ার আগে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষই হল প্রথম স্থান যেখানে তুলো চাষ করা হয়। হরপ্পা যুগে ২৫০০ খ্রিঃ পূঃ।

সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি সেই সময় বস্ত্রের ব্যবহারের সু-বন্দোবস্ত ছিল। ছেলেরা লম্বা কাপড় পরত এবং মেয়েরা কাঁধের পিছন থেকে লম্বা কাপড় সমানের দিকে ঝুলিয়ে দিত। এছাড়া বেশ কয়েকটি যুগে কাপড়ের প্রচলন দেখা গেছে। যেমন—বৈদিক যুগ, মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ, মোঘল যুগ ইত্যাদি। তবে দেখা গেছে যে যুগ বিভাজনের সাথে সাথে বস্ত্রের মান উন্নত হয়েছে এবং সকলেই নিজস্ব ঐতিহ্যের বা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি নির্দিষ্ট পোশাক বেছে নিয়েছে। এক্ষেত্রে আসামেরও একটি নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক লক্ষ্য করা যায়। আসামে পুরুষেরা গামছা ও ধুতি পরিধান করে এবং মহিলারা মেখলা নামক একটি বস্ত্র পরিধান করে। তবে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই একটি Common বিষয় হল গামছা। আসামে কোন বহিরাগতদের আগমন হলে সাধারণত তাদের ঐতিহ্যবাহী গামছা দিয়েই সংবর্ধনা জানিয়ে থাকে। আসাম হল সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যবাহী রাজ্য। আসামের সংস্কৃতিতে যেমন বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তেমনি তাদের পোশাকেও এখানে সূতি বস্ত্রের প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়। আসামের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের বিস্তৃত আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হল।

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ঐতিহ্য দেখা যায় এবং সেগুলো নিচে আলোচনা করা হল—

সিন্ধু সভ্যতার যুগ ঃ হরপ্পাবাসী বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক ব্যবহার করত তার প্রমাণ খুব বেশি নেই। তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় হরপ্পাবাসী তুলোর ব্যবহার জানত। যেমন পুরুষরা লম্বা কাপড় পরত এবং মাথায়

সরকার, নয়ন ও বিশ্বাস, তপন কুমার : আসামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 18-22, ISSN 2249-4332

পাগড়ি পরত। তবে উচ্চ শ্রেণিরাই এই ধরনের পোশাক পরত। মেয়েরা কাঁধের পিছন থেকে লম্বা কাপড় সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিত। সুতির তৈরি মাথা ঢাকা পোশাকও মেয়েরা পরিধান করতো।

বৈদিক যুগঃ বৈদিক যুগের সময়কাল হল ১৫০০-৭০০ খ্রিঃ পূঃ। এই যুগে নারী-পুরুষ প্রধানত এক কাপড়ের পোশাক পরে দেহ আবৃত করত। একে বলা হত 'পরিধান'। শীতকালে পড়ত 'প্রভারা'। মেয়েরা প্রধানত শাড়ি পরত। এছাড়া তারা দেহের নিম্নাংশের একটি পোশাক পরত এবং উর্ধ্বাংশ অর্থাৎ নাভীর উপর থেকে অন্য পোশাক পরত যা ছিল ব্লাউজের মত।

মৌর্য যুগঃ মৌর্য যুগে (৩২২-১৮৫ খ্রিঃ পূঃ) কাপড়ের বহুল প্রচলন ছিল। এই সময় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হত 'অন্তরিয়'। যা দিয়ে তারা দেহের নিম্নাংশ ঢেকে রাখত। এগুলি ছিল সাধারণত সুতো, নাইলন, উল, মসলিন। এগুলি বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হতো।

গুপ্ত যুগঃ গুপ্ত যুগের সময়কাল হল ৩২০-৫৫০ খ্রিঃ পূঃ, যা ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। এই সময় সেলাই করা পোশাক ব্যবহার হত। সেলাই করা পোশাক পরিধান করা ছিল রাজকীয় লক্ষণ। সাধারণ উচ্চশ্রেণির লোকেরা এই ধরনের পোশাক ব্যবহার করত। এই সময় মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করত। বিশেষত ব্লাউজের রকমারি বেশি চোখে পড়ে। অনেক সময় এমন ব্লাউজও মহিলারা পরত যাতে তাদের পিঠ পুরো খোলা থাকত।

মোঘল যুগঃ বস্ত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয় মোঘল যুগকে। এই সময় বস্ত্রের সাথে সাথে অলঙ্কারেও সমান নজর দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়ই অলঙ্কার পরিধান করত। এই সময় সাধারণত তিন ধরনের মসলিন সুতোর ব্যবহার করা হতো। যা হল আবে-ই-রাওয়ান, কাপট হাওয়া, শবনম। মোঘল রাজরাজারা এই তিন ধরনের কাপড়ের ব্যবহার করত। এই যুগে মোঘল পুরুষেরা পরিধান করতো জামা, পটকা, ছোনা, পাপড়ি যা কিনা মোঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করত।

আর মহিলারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বস্ত্র অলঙ্কার পড়ে সুসজ্জিত থাকত সবসময়। সাধারণত অনুষ্ঠানের সময় তারা পরিধান করত পেশোয়াজ, পা-জামা, চুড়িদার, ঘাগরা ইত্যাদি। অলঙ্কারের মধ্যে হাতের বালা, নাকের নথ। এই অলঙ্কার ও বস্ত্রগুলোই নানান ভাবে ব্যবহার করে নিজেদের ভূষিত করত।

আসামে একসময় ব্যাপারীরা এতদঞ্চলের উৎপন্ন তুলা এনে কাটুনিদের দিত। কাটুনিদের কাছে থেকে তাঁতিরা কিনে নিত সেই সুতো, তাই দিয়ে কাপড় বুনত। সূক্ষ্ম সুতো তৈরিতে আসাম কাটুনিরা খুব দক্ষ ছিল। তাদের রোজগারও মন্দ হত না। কিন্তু যেদিন থেকে (১৮২৪ খ্রিঃ) বিলাতি সুতোর আমদানি আরম্ভ হল, সেদিন থেকে কাটুনিদের ভাতে টান পড়ল। আমদানি যত বাড়ল দেশি সুতার ব্যবহার তত কমতে লাগল, শেষে বন্ধই হয়ে গেল একসময়। যা দেশীয় তাঁতশিল্পের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। বর্তমানে আসামের কিছু মিলে মোটা সুতো তৈরি হলেও সুতোর জন্য এ রাজ্যের তাঁতিদের দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কোয়েম্বাটুর থেকে সুতি, সুরাট থেকে জরি, ব্যাঙ্গালোর ও মুম্বাই থেকে সিল্ক এজেন্টের মাধ্যমে প্রথমে গুয়াহাটি বড়বাজারে আসে এবং পরে এখান থেকে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় দোকান বা রিটেল কাউন্টারে চলে যায়।

পূর্বে তাঁতিরা প্রাকৃতিক বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, ফল, ফুল, ফলের বীজ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা থেকে রং প্রস্তুত করত। হাট থেকে কিনে আনা সাদা সুতোকে তারা এই রং দিয়ে রাঙাতো, কোন রঙের কোন রঙ, কতটুকু মিশালে মূল রঙ কি দাঁড়াবে, কতটুকু সুতোর জন্য কতটুকু রঙ জলে গুলতে হবে এবং কি উপাদান মিশ্রিত করা হলে রঙের স্থায়িত্ব আসবে এসব কৌশল ছিল তাদের বংশপরম্পরায় অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। ইংরেজ আমলে সহজলভ্য বিদেশি রং আমদানির ফলে তাঁতিরা দেশিয় পদ্ধতিতে তৈরি কঠিন ও শ্রমসাধ্য এ রঙ তৈরি করা ছেড়ে দিয়ে আমদানিকৃত সহজলভ্য ব্যবহারের

দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে রঙ তৈরির দেশিয় পদ্ধতিটি ক্রমান্বয়ে বিস্মৃতিতে অতলে হারিয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ৩টি বা ৫টি রঙের মিশ্রণে নানা বর্ণের রঙ তৈরি শুরু হয়। এই রং মিশ্রণের অনুপাত ও স্থায়িত্বের কলাকৌশল নিয়ে নতুন এক শ্রেণির 'রঙ শিল্পী' সৃষ্টি হয়। এরা ইংরেজ আমল থেকে দেশভাগ হওয়ার সময় পর্যন্ত তাদের পেশা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে মিল থেকেই বিভিন্ন রঙের সুতো তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সুতার বড় মহাজনরা ফ্যাক্টারির মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক সুতো রং করে নিচ্ছে।

পূর্বে সূচে নকশা তোলা হতো, পরে জালা ও ঝাপে, হাতে ঠেলা মাকুতে এই নকশা বোনা হতো। তারপর তৈরি হল ঠকঠক তাঁত (Fly Shuttle Loom), বসল নকশা তোলা কল (Jacquard Machine)। ঝাঁপে ৪০/৫০ ডাঙ্গি পর্যন্ত নকশা হত, কলে হত ১৫০ থেকে ৪০০ ডাঙ্গি পর্যন্ত।

একসময় তন্তুবায়রা বংশগত ভাবে তাঁত বুনলেও বর্তমানে তাঁত আর শুধুমাত্র তাদের দখলে নেই। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল কে নেই তাঁতে। কাজের খোঁজে সবাই আসছে। শিক্ষিত বেকাররা, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকরা, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিতরা। অন্য পেশার প্রসার যেখানে রুদ্ধ হয়েছে, সেখানে তাঁত তার ক্ষেত্র বিস্তারিত করে দিচ্ছে। ফলে বর্তমানে শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষই নয়, তাঁতশিল্পে অঞ্চলের বাইরে থেকেও প্রচুর শ্রমিক এসে তাঁতের কাজ করছেন। তাঁতের সহায়ক কাজেও অনেক মানুষের রুজি রোজগার হচ্ছে। সুখের কথা বেকারপূর্ণ এই দেশে তাঁতের কাজ বহু মানুষকে বেকার শূন্য করছে।

সুদীর্ঘকাল ধরে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তুজীবীরা মোটা সুতি বস্ত্রের উৎপাদনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক রুচিশীল জনসাধারণের রুচিমাফিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম সরকার যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বয়নে, রঞ্জনে ও চিত্তে চমৎকারী নক্সাযুক্ত বস্ত্র উৎপাদনে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পূর্বে ডিসেন্ট্রালাইজড ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ইন্টিগ্রেড হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে তন্তুজীবীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম করা হচ্ছে।

আসাম হল সংস্কৃতিতে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রাজ্য। যার ফলে এখানে ঐতিহ্যবাহী পোশাকেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। তেমনি পোশাকেরও নানারূপ দেখা যায়। সাধারণত ঐতিহ্যগত পোশাক কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি তা হল—

১. ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক
২. নিম্নাঙ্গের পোশাক
৩. কোমরবন্ধ
৪. টুপি
৫. পাগড়ি
৬. উত্তরীয় বা চাদর
৭. অন্যান্য

ঊর্ধ্বাঙ্গ বলতে বুঝি কোমরের ওপরের অংশ। আসামের পুরুষেরা ওপরের দিকে পাঞ্জাবি, গামছা, ঝাঁপি ইত্যাদি পরিধান করে। পাঞ্জাবিগুলি সুতির সুতো দিয়ে তৈরি হয়। বিভিন্ন ঐতিহ্যমূলক আচার অনুষ্ঠানে এগুলি পরা হয়। এছাড়া আসামের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র হল গামছা, যা উত্তরীয় হিসাবেও পরিধান করা হয়। আসামের কোন ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর জন্য এই গামছাই উত্তরীয় হিসাবে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়।

নিম্নাঙ্গ বলতে কোমরের থেকে নিচ পর্যন্ত। আসামের পুরুষেরা নিম্নাঙ্গে ধুতি গামছা পরিধান করে। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ও আচার অনুষ্ঠানে ধুতি এবং গামছা পরে তারা। তাছাড়া গামছা বছরের সবসময় পরিধান করা হয়। এখনকার আধুনিক বস্ত্র যেমন প্যান্টও তারা ব্যবহার করে।

অসমিয়া পুরুষ ও মহিলারা নানারকম অনুষ্ঠানে যেমন—বিহুতে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে। আসামের

বিভিন্ন উপজাতিরাও তাদের নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র পরিধান করে। যেমন—গলায় বিভিন্ন হার পরিধান করে, যেগুলি পশুর হাড় দিয়ে তৈরি এবং পায়ের অলংকার পরিধান করে। সবশেষে বলা যায় যে আসামের পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রের বিভিন্নতা থাকলেও গামছা ও অ্যারানাই তাদের এক করে রেখেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. কলিতা, রমেশচন্দ্র, আসামের কালানুক্রমিক ইতিহাস, আসাম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটী, ২০০৬।
২. কোচ, শিবেন্দ্র নারায়ণ, কোচ জনগোষ্ঠীর অতীত সন্ধানত এটি খোজ, মেঘালয় কোচ সম্মিলন, তুরা, মেঘালয়, ২০১২।
৩. গগৈ, লীলা, বিহু-এটি সমীক্ষা, বনলতা, গুয়াহাটী, ২০১০।
৪. গোস্বামী, মুকুলচন্দ্র, লোকসংস্কৃতি আরু বিহু, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটী, ২০১২।
৫. তালুকদার, ধ্রুবকুমার, আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক-উৎসব, বনলতা, গুয়াহাটী, ২০১১।
৬. দত্ত গোস্বামী, প্রফুল্ল, বহাগ বিহুর বারেবরণীয়া ছবি, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটী, ১৯৭৫, ২য় প্রকাশ ১৯৯৬।
৭. দত্ত, সুমন, অসমত জনজাতীয় অধ্যনর পরিক্রমা, বনলতা, গুয়াহাটী, ২০১৫।
৮. দাস, মুনীন্দ্র, জনজাতিকরণের দাবী আর জনগোষ্ঠীর আন্দোলন, অসম বুক ট্রাস্ট, গুয়াহাটী, ২০১৫।
৯. নাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, আসাম বুরুজীর মণি-মুকুতা, এন. এল. পাবলিকেশন, কোক্রাঝার, ২০১২।
১০. নাথ, দ্বিজেন, গোয়াল পারিয়া লোকসংস্কৃতি, বনলতা, গুয়াহাটী, ২০০৮।
১১. নাথ, প্রফুল্ল কুমার, আসামের লোকজীবন আরু সংস্কৃতি, এন. এল. পাব., গুয়াহাটী, ২০১১।
১২. নার্জি, ভবেন, বড়ো কছারীর সমাজ আরু সংস্কৃতি, বীণা লাইব্রেরী, গুয়াহাটী, ১৯৬৬, পু. মু. ২০০৯।
১৩. ভকত, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ, অসমের কোজ-রাজবংশী জনজাতি, সেন্টার ফর এথনিক স্টাডি এণ্ড রিসার্চ চিলারায় কলেজ, গোলকগঞ্জ, ধুবরী, ২০০৮।
১৪. ভকত, ড. দ্বিজেন্দ্র নাথ, লোকসংস্কৃতির সুবাস, সেন্টার ফর এথনিক স্টাডি এণ্ড রিসার্চ, চিলারায় কলেজ, গোলকগঞ্জ, ধুবরী, ২০১১।
১৫. বর্মন, শান্ত, গোয়ালপারার জন ইতিহাস, অশোক পাবলিকেশন, গুয়াহাটী, ২০০৯।
১৬. ভকত, লাবণয, রাজবংশী লোকসংস্কৃতি, বনমালী প্রকাশন, ধুবরী, ২০১৪।
১৭. রাভা হাকাচাম, ড. উপেন, অসমীয়া আরু অসমের জাতি গোষ্ঠী ঃ প্রসঙ্গ অনুসঙ্গ, কিরণ প্রকাশন, গুয়াহাটী, ২০১৩।
১৮. রায়চৌধুরী, অনিল, নামনি অসমর সামাজিক পটভূমি, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটী, ২০১২।
১৯. শর্মা, ড. নবীনচন্দ্র, অসমর কৃতি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অশোক বুকস্টল, গুয়াহাটী, ২০১২।
২০. শর্মা, ড. নবীনচন্দ্র, অসমীয়া লোকসংস্কৃতির আভাষ, বাণী প্রকাশ প্রাঃ লিঃ, গুয়াহাটী, ১৯৮৯, ৫ম প্রকাশ ২০১১।
২১. শর্মা, ড. নবীনচন্দ্র, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিবেশ্য কলা, বনলতা, গুয়াহাটী, ২০০৯।
২২. খাঁ চৌধুরী আমনাতউল্লা আহমেদ, কোচবিহারের ইতিহাস (১ম), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫, পুনর্মুদ্রণ ২০১২।
২৩. চৌধুরী, আর্য, উত্তরবঙ্গের মাটি মানুষের গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৮।
২৪. রায়, কৃষ্ণেন্দু, উত্তরবঙ্গের সীমান্ত, দি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৩।
২৫. রায়, দীপককুমার, হাজং ভাষা, সোপান, কলকাতা, ২০১৩।
২৬. রায়, জ্যোতির্ময়, রাজবংশী সমাজ দর্পণ, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১২।
২৭. সাহা, বিপ্লবকুমার সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ঃ উত্তরবঙ্গ ও অসম, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।
২৮. Basumatary, Phukan. *The Rabha tribe of North Bast India, Benhal and Bangladesh,* Mittal Pub. New Delhi, India, 2010

২৯. Chandra Bipan. *Indias Struggle for Independence*, Penguin Books India, 1988.

৩০. Deka, Umesh Edt. *A Glimpse of Language & Culture of North East India*, Colourplus. Guwahati, 2012

৩১. Husain, Majid. *Indian and Polity* McGraw Hill Education (India) Private Limited, 2014.

৩২. *INDIA 2015*, Comiled by New Media Wing, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

Website
http://www.academic.edu
http://www.timedta.com
http://www.unesco.org
http://www.indiaonline.in
http://www.google.co.in
http://www.wikipedia.org

নয়ন সরকার ও তপনকুমার বিশ্বাস
লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদিয়া।

প্রসঙ্গ জনস্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা ঃ প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলা

পলাশ দে

বর্তমানে ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ দিক হল স্থানীয় ইতিহাস চর্চা। বৃহত্তর ইতিহাস চর্চা বা জাতীয় ইতিহাস চর্চা অনেক সময়ই স্থানীয় ইতিহাসের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। ফলতঃ এই ধরনের ইতিহাস চর্চার মধ্যে তথাকথিত বেশকিছু 'শূন্যস্থান' থেকেই যায়। আর মূলতঃ স্থানীয় ইতিহাস চর্চা এই 'শূন্যস্থান' গুলি পূরণ করে জাতীয় ইতিহাস চর্চাকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। এই ধরনের (স্থানীয় ইতিহাস চর্চা) ইতিহাস চর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অথবা কোন একটি ছোট্ট স্থানের উপর গভীর গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়গুলিকে যথাযথ রূপে তুলে ধরা। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। এছাড়াও স্বল্প সময়েও স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা যায়। এখানেই স্থানীয় ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব নিহিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নদিয়া জেলার জনস্বাস্থ্য'কে স্থানীয় ইতিহাসচর্চার আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি।

আলোচনা'র প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় নদিয়া জেলা কিন্তু বাংলার কিংবা ভারতবর্ষের গঠন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল—এরকম ভাবার কোন কারণ নেই। আলোচ্য সময়কালে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে সারা ভারতবর্ষে যে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল আলোচ্য জেলাতেও তার প্রমাণ মেলে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এই বদল একদিনে বা একসময়ে ভারতের সব জায়গায় হয়নি। নদিয়া জেলা'র ক্ষেত্রে একথা সত্য।

ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলা ছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর-পূর্ব অংশ। এই জেলা ২৪°১১' থেকে ২২°৫৩' উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৯°২২' থেকে ৮৮°৯' পূর্ব অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১] এই জেলা পদ্মা নদীর মাধ্যমে উত্তরে রাজশাহী ও পাবনা থেকে; উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা এবং পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল ভাগীরথী নদীর দ্বারা। এই জেলার বাকী দিকগুলিতে কোনও প্রাকৃতিক সীমানা ছিল না। এই জেলা দক্ষিণে ২৪ পরগণা জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে যশোর, পূর্বে ফরিদপুর জেলা দিয়ে বেষ্টিত ছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলির মত আলোচ্য জেলাটিও নদীমাতৃক ছিল। এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি ছিল ভাগীরথী, পদ্মা, ভৈরব, মাথাভাঙা, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী এবং ঘরাই। এছাড়াও ছিল বিল ও জলাভূমি। আভাঙ্গী, আদিত্যপুর, বাচামারী, বৈরামপুর, বকশী, বালিদহ, দিগরী, ডুমরী প্রভৃতি (সদর মহকুমা), আমডা, বালি, ভোমরা, ছিনলি, ডাম্রাইল, ডোহার, হারিপুর, কুলিয়া প্রভৃতি (রাণাঘাট মহকুমা), বারাদী, বেগমপুর, চাকলী, ডামকা, কুন্বিলা, পাকর, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি (ছুডাঞ্গা মহকুমা), আশরাফপুর, মাহিষমারী, রুইমারী, সোনাদহ, টোপ্পা প্রভৃতি (মেহেরপুর মহকুমা) এবং আমলা, বারাদী, বোরালিয়া, সাগরখালি, আলবেরিয়া প্রভৃতি (কুষ্টিয়া মহকুমা)। এই জেলার মৃত্তিকা ছিল আলুভিয়াল ও বালি মৃত্তিকা।[২]

নদিয়া জেলার জনস্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় জনস্বাস্থ্য-এর ধারণার বিষয়টি। 'জনস্বাস্থ্য' হলো কয়েকজন সুদক্ষ চিকিৎসক কর্তৃক রোগ-ব্যাধি ও মহামারী থেকে মানবদেহকে রক্ষা করা। 'জনস্বাস্থ্য' অনেকটাই নির্ভর করে পরিচ্ছন্নতার উপর। ভারতবর্ষে 'জনস্বাস্থ্যের আধুনিক ধারণা'টি অবশ্য ব্রিটিশদের দ্বারা আমদানি করা। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রাথমিক পর্বে ভারতে 'জনস্বাস্থ্য রক্ষা' অথবা 'জনস্বাস্থ্য নীতি' বলতে বোঝাত—ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় কর্মচারী, অফিসার এবং সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। তবে ১৮৬৬ সালে কনস্টান্টিনোপলের অধিবেশনে[৩] বিশ্বে রোগ-

দে, পলাশ : প্রসঙ্গ জনস্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা ঃ প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 23-30, ISSN 2249-4332

ব্যাধি বিস্তারের জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করা হলে তারা ভারত নামক উপনিবেশে ভারতীয়দের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলা ছিল রোগ-ব্যাধির আতুঁড়ঘর। একদিকে যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও কালাজ্বরের মতো মহামারী'র রক্তচক্ষু দর্শানো, তেমনি অন্যদিকে আন্ত্রিক, আমাশয়, সর্দি-কাশি, জ্বর-জ্বালা ও বিভিন্ন প্রকারের পেটের রোগ ছিল বাঙালির নিত্যদিনের সঙ্গী। এককথায়, বাঙালিরা মহামারীর সাথে বাস করত। রোগ-ব্যাধি ও মহামারীর সম্পর্কে মানুষের ধারণাও ছিল বিভিন্ন প্রকারের। কেউ-কেউ মনে করত, নোংরা-আবর্জনা ও দূষিত পরিবেশই ছিল মহামারীর জন্য দায়ী।[৪] আবার অনেকে বন্যা, আকাল এবং খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিকে এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৫] বাঙালিরা রোগ-মহামারীকে দেব-দেবীর অসন্তুষ্টির কারণরূপেও আখ্যা দিয়েছেন। সঙ্গে ছিল ছোঁয়াচে রোগের ধারণা। যার জন্য রোগ এবং রোগীর সংস্পর্শ মানুষ এড়াতে শুরু করল। সমাজে তৈরি হলো 'রোগী' নামক ধারণাটি। যিনি (রোগী) 'সাধারণ মানুষ' থেকে আলাদা।[৬] যাই হোক, রোগ ও মহামারীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আঙ্গিকে নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলার প্রেক্ষাপটে প্রধানতঃ পাঁচটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ মহামারীর নির্মাণ নির্ভর করেছিল মানুষের সাথে মহামারীর চেনা-জানার ওপর। ম্যালেরিয়ার মতো মহামারী এবং জ্বর-জ্বালা ও পেটের রোগের সাথে সুপরিচিত থাকায় নিত্য জীবনের ঘটনা প্রবাহেরই একটি বিশেষ অংশ ছিল। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা এবং মহামারীর ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হয়েছিল। বাংলায় সবচেয়ে মৃত্যুর হার বেড়ে ছিল ম্যালেরিয়া মহামারীর থেকে। কিন্তু কলেরার মতো হঠাৎ মৃত্যু ম্যালেরিয়াতে হতো না। ধীরে-ধীরে ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হতো। সেইজন্য ম্যালেরিয়া মহামারীর তুলনায় কলেরা অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। ফলত কলেরা থেকে বাঁচতে 'ওলাবিবি' বা 'ওলাইচণ্ডী'কে সন্তুষ্ট করতে হতো। কিন্তু ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে জ্বরাসুরের পূজা করার রীতি কয়েকটি এলাকায় প্রচলিত থাকলেও বাংলায় সর্বব্যাপী রূপ লাভ করতে পারেনি। তৃতীয়তঃ, মহামারীর ভৌগোলিক বিস্তারের ওপরও মহামারীর নির্মাণ নির্ভর করত। ম্যালেরিয়ার যেহেতু সর্বভারতীয় একটি ভয়ঙ্কর রূপ ছিল, সেহেতু তার আতঙ্ক কলেরা মহামারীর বা বসন্ত মহামারীর সাথে মিল ছিল না। চতুর্থতঃ, সমাজের মহামারী আক্রান্ত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানও ম্যালেরিয়ার নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশদের নিরাপত্তা সাম্রাজ্যবাদ ও আর্থিক স্বার্থের সাথে জড়িত শ্রেণী যখনই মহামারীতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তখনই ব্রিটিশ সরকার মহামারী থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শেষতঃ, বিশেষ প্রেক্ষাপটের ওপরও মহামারীর নির্মাণ নির্ভর করেছিল।[৭] বাংলার তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ পটভূমি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

রোগ-মহামারীর এই ধারণাকে কেন্দ্র করে মহামারী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। ঔপনিবেশিক বাংলায় রোগ-মহামারীর প্রকোপ দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত ছিল যে, এই রোগ-মহামারী গুলি একান্তভাবে দেশীয়দের। তাঁদের মতে, বাঙালিরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে ভালোবাসত। এই রোগগুলিকে তারা 'উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ' বা 'ট্রপিক্যাল ডিজিজ' (Tropical Diseases) নামে চিহ্নিত করেছিল। এই রোগগুলি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে Patrik Manson কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'School of Tropical Medicine'।[৮]

অবশ্য এর সাথে যুক্ত হয়েছিল 'জাতিতত্ত্ব' এবং 'শারীরিক সক্ষমতা'র মতো বিষয়গুলিও। ব্রিটিশরা নিজেদেরকে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মনে করত। সেইসঙ্গে এও তারা ধরে নিয়েছিল যে, সারা বিশ্বকে শাসন করার একমাত্র আধিকারিক হলেন তারা।[৯] জনস্বাস্থ্যের বিষয়েও জাতিতত্ত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জাতিগত বিভেদ ভারতীয়দেরকে ব্রিটিশ জনস্বাস্থ্য নীতির পরিধিতে স্থান দিয়েছিল।[১০] যদিও ব্রিটিশদের তরফ থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 'Indian Medical Service' এর ভারতীয়করণ শুরু হয়েছিল, তবে তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন ইউরোপীয় আধিকারিকগণ। 'জাতিতত্ত্বের ধারণা'র সঙ্গে 'শারীরিক সক্ষমতা'র বিষয়টিও যুক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশরা নিজেদেরকে ভারতীয়দের থেকে শারীরিক ভাবে বেশি শক্তিশালী মনে করতেন এবং তার বহিঃপ্রকাশের

জন্য শিকার ও খেলাধূলার মতো পুরুষোচিত বিষয়গুলির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতেন। অন্যদিকে দুর্বল, পেট রোগা বাঙালিদের 'effeminate babu' বা 'মেয়েলিবাবু' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। ব্রিটিশ জনস্বাস্থ্যনীতির পরিকল্পনায় দুর্বল ভারতীয় শরীরের সত্যিকারের কোনো জায়গা ছিল না।[১১]

আলোচ্য সময়কালে নদিয়া জেলা একসময় স্বাস্থ্যকর স্থানরূপে পরিগণিত হতো। কিন্তু উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। L. S. S. O'Malley, W. W. Hunter-এর রচনাতে দেখা যায়—নদিয়া জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছিল।[১২]

ম্যালেরিয়া ঃ ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলার অন্যতম ভয়াবহ রোগ-মহামারী ছিল ম্যালেরিয়া। ঔপনিবেশিক বাংলায় ম্যালেরিয়া মহামারীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—যশোর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে সর্বপ্রথম ১৮২০-র দশকে ম্যালেরিয়া মহামারীর উদ্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে অনেক প্রাণহানিও ঘটেছিল। যশোর জেলা থেকে এই মহামারী নদিয়া জেলাতেও পৌঁছায় এবং এর প্রায় দশ বছর পর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৯০৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে আলোচ্য জেলার ম্যালেরিয়া মহামারী সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিষ্কার হয়।[১৩] যথা—

১. সমগ্র নদিয়া জেলা ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং জ্বর লক্ষণাক্রান্ত;
২. সবচেয়ে ম্যালেরিয়াপ্রবণ থানাগুলি ছিল—করিমপুর, গাংনি, জীবনপুর, কুমারখালি ও নয়াপাড়া; এবং
৩. আর সবচেয়ে কম ম্যালেরিয়াপ্রবণ থানাগুলি ছিল—কৃষ্ণনগর, চাপড়া, চাকদা ও মেহেরপুর।

কলেরা ঃ ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার পর সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হত কলেরার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম নদিয়া জেলার নবদ্বীপে কলেরার উদ্ভব হয়েছিল। আর অল্প সময়ের মধ্যেই এই রোগটি মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। আলোচ্য সময়ে বেশ কয়েকবার এই জেলা ভয়াবহ মহামারীর সাক্ষী থেকেছে। সাধারণত শীতকালে এই মহামারী ভয়াবহ আকার ধারণ করত; আর বর্ষাকাল শুরু হলে এই রোগটির প্রকোপ কমে যেত। এই মহামারী ১৮৯৫-১৮৯৬ সালে এই জেলায় সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে প্রাণহানিও হয়েছিল অনেক। প্রতিদিন কমপক্ষে মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ৩০০-র বেশি।[১৪]

অন্যান্য রোগসমূহ ঃ উপরে আলোচিত রোগ দুটি (ম্যালেরিয়া ও কলেরা) ছাড়াও ডায়রিয়া, আমাশয়, বসন্ত, কুষ্ঠ ও প্লেগ ইত্যাদি রোগগুলিও আলোচ্য জেলায় ছিল। তবে এই রোগগুলির কোনটিও মহামারীর আকার পরিগ্রহ করেনি। আরও বড় কথা হল—এই রোগগুলির কারণে মৃত্যুর হারও ছিল তুলনামূলক ভাবে খুব নগণ্য। এছাড়া অন্ধত্ব পরিচিত থাকলেও আলোচ্য জেলায় মানুষজন এই রোগটিতে আক্রান্ত হত না বললেই চলে।

পশ্চিমী চিকিৎসাতত্ত্বের প্রয়োগ ঃ পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ছিল বিজ্ঞানসম্মত। এই ব্যবস্থার সঙ্গে একদিকে যেমন বিজ্ঞানমনস্কতা অন্যদিকে তেমনি এর যোগ ছিল ল্যাবোরেটরি বা গবেষণাগারের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, অ্যানাটমি, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, কোষের আবিষ্কারসহ মাইক্রোস্কোপের মতো একাধিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যায় একেবারে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। এগুলির সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে উনিশ শতকের ষাটের দশকে রোগের কারণ হিসাবে ইউরোপে আবিষ্কার হলো 'Germ Theory' বা 'বীজাণু তত্ত্ব'।[১৫]

১৮৮৩ সালে রবার্ট কোচ মিশরে কলেরার 'Comma Bacillus' আবিষ্কার করলেন। এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু 'পরিচ্ছন্নতা' (Sanitation) থেকে 'Epidemiology' 'মহামারীবিদ্যা'তে সরে গেল। আর ভারতে গুরুত্ব পেল bacteriology—যা প্রতিষ্ঠা করেছিল ছোট বড় বেশ কয়েকটি Bacteriological Laboratory-র। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বোম্বের 'Plague Research Laboratory'—যা ১৮৯৬ সালে হফকিন-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর উনিশ শতকের শুরুতে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবোরেটরি যথাক্রমে—মাদ্রাজে 'King Institute of Preventive Medicine' এবং কৌশালিতে 'Pasteur Instutute'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[১৬]

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই গতিধারায় অন্যতম সফল দুই বৈজ্ঞানিক ছিলেন Dr. Lamp এবং Roland Ross। প্রথমজন প্যারিসে 'Pasteur Instutute' থেকে শিক্ষণ গ্রহণ করে বোম্বের 'Plague Research Laboratory' তে Haffkine-এর সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি (Dr. Lamp) ভারতে 'ভূমধ্যসাগরীয় জ্বর এবং মাল্টা জ্বর-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন।[১৭] ম্যালেরিয়ার একধরনের রূপ হিসাবে এগুলিকে চিহ্নিত করলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬০-এর দশকে নদিয়া জেলার ম্যালেরিয়া মহামারী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর C. E. Buckland এই মহামারীর সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। একটি মারাত্মক মহামারী প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগে দেখা দিয়েছে এবং প্রচুর প্রাণহানিও হওয়ার ফলে ১৮৬২ নাগাদ Dr. J. Elliot আক্রান্ত জেলাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত হন। তিনিও মৃত্যুহারের ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন এবং ঔপনিবেশিক সরকারকে এর থেকে মুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু উভয়েই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সরকারের পদক্ষেপ যথেষ্ঠ ছিল না এবং এই মহামারীর বিস্তার রোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে দু'বছর এই জেলাবাসীরা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে মুক্তি পেলেও পুনরায় ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সালে এই মহামারীর আবার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তারপর ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে এই জেলাবাসীরা এই মহামারীর প্রকোপে পড়েছিল। অনেক প্রাণহানির সঙ্গে প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিটি মহামারীগুলি থেকে মৃত্যুর হার ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ।[১৮]

এরকম পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক সরকার এই মহামারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং তা রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি 'Fever Commission' গঠন করেন। এই কমিটি এই মহামারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে কারণগুলি দর্শানোর কথা বলেছেন। তাঁরা মূলত নিম্নলিখিত কারণগুলিকে এই মহামারীর উদ্ভবের পিছনে দায়ী করেছেন।[১৯]

১. পুকুর, ডোবা, খাল-বিল এবং বাড়ীর চারপাশে জল জমে থাকা;
২. বাড়ীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল প্রভৃতির অবস্থান;
৩. জনবসতির খুব কাছাকাছি এলাকায় ধান চাষ করা; এবং
৪. জঘন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা।

১৯০৬-১৯০৭ সালে Drainage Commission-ও এই কারণগুলিকে ম্যালেরিয়া মহামারীর বিস্তারের জন্য দায়ী করেছেন।

ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলার জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ইতিহাস আলোচনা করার প্রারম্ভে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আমরা ঔপনিবেশিক বাংলার জনস্বাস্থ্যের সার্বিক মিল ও অমিল—দুই খুঁজে পাই। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিল বাংলা থেকে, বিশেষত মুর্শিদাবাদ থেকে। পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যেমন রাজনৈতিক ভিত্তি দিয়েছিল, তেমনি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ ইংরেজদের ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বাংলায়। এই সূত্রে নদিয়া জেলাও পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্রিটিশরা 'সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার'[২০] রূপে ব্যবহার করেছিল।

নদিয়া জেলার অন্যতম হাসপাতাল ছিল রাণাঘাট মেডিক্যাল মিশন। ১৮৯৩ সালে ঔপনিবেশিক বাংলার সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জেমস্ মুনরো এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনটির কার্যকলাপ চলত ইংল্যাণ্ডের চার্চ এবং কলকাতার বিশপের নির্দেশে। তবে প্রাথমিকভাবে এই মেডিক্যাল মিশনটি পরিচালিত হতো জেমস্ মুনরো এবং ওনার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা। পরবর্তীকালে ঐ মিশনের কর্মচারীর সংখ্যা যাতে কমে না যায় এবং হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে না যায়, সেইজন্য ১৯০৫ সালের পর চার্চ মিশনারি সোসাইটির হাতে মিশনটির পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়।[২১]

এই মিশনটি রাণাঘাটে একটি হাসপাতাল এবং একটি ডিসপেনসারী চালু করেছিল ১৮৯৪ সাল নাগাদ। প্রতিষ্ঠাকাল

থেকে শুরু করে প্রায় নয় মাস পর্যন্ত প্রায় আঠাশ হাজার রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছে এই হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীটি। ধীরে ধীরে রোগীর চাপ আরও বাড়তে থাকায় সরকার ভারতীয়দেরও পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করেছিল। ডাফনির ফাণ্ডের সাহায্যে এদেশীয় মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ইতিমধ্যে মিশন লাগোয়া একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়—যেখানে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষাদান চলতে থাকে। ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে রাণাঘাটের পাশাপাশি তিনটি গ্রামে পৃথক ডিসপেনসারী তৈরী করা হয়েছিল এবং বড় সংখ্যক রোগী এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পরিষেবা পেত। ১৯০২ সালে এই মিশনের প্রধান কার্যালয় রাণাঘাট থেকে প্রায় এক মাইল দূরে এক স্থানে স্থাপিত হয়েছিল—যে স্থান বর্তমানে দয়াবাড়ী নামে পরিচিত। এখানে প্রায় এক হাজার রোগীর চিকিৎসা করার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল চল্লিশটি বিছানার একটি হাসপাতাল। এছাড়াও সেখানে ডাক্তার এবং নার্সদের থাকার সুব্যবস্থা ছিল।[২২]

দেশীয় প্রতিক্রিয়া ঃ ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলায় পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ কিছু সময় দেশীয়দের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলেও বেশির ভাগ সময়ই দেশীয়রা পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে খুব একটা আমল দেয়নি। এর পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। যথা—

প্রথমতঃ দেশীয় মানুষেরা মনে করত, পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা হল প্রকৃতপক্ষে দেশীয়দের ধর্ম বিনাশের পথ ও প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ভারতীয়রা ব্রিটিশদের ম্লেচ্ছ মনে করত, সেহেতু সাধারণ জনগণের ব্রিটিশদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

তৃতীয়তঃ পশ্চিমী ঔষধপত্র ছিল তুলনামূলক ভাবে অধিক ব্যয় সাপেক্ষ।

চতুর্থতঃ দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির অর্থাৎ আয়ুর্বেদ এবং ইউনানীর প্রতি মানুষের ছিল অগাধ আস্থা।

অবশ্য, দেশীয় মানুষদের এই বিশ্বাসের একটা বড় ভিত্তিও ছিল আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং উভয় বিজ্ঞানই বহু রোগমুক্তির উপায় হিসাবে পরিগণিত। বাংলার অন্যান্য জেলাবাসীদের মতো ঔপনিবেশিক নদিয়াবাসীরাও নির্ভর করত এই দুই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর। আলোচ্য জেলাতেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক (যারা 'কবিরাজ'[২৩] নামে পরিচিত ছিল)-দের আধিপত্য ছিল 'হাকিম'দের[২৪] (ইউনানী চিকিৎসক) তুলনায় ভালো। এই জেলায় বংশানুক্রমিকভাবে কবিরাজদের চিকিৎসার উদাহরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যক্ষেত্রে। যখন কোন রোগ-মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এদের কোন সুরাহা মিলছে না, তখন বাধ্য হয়েই দেশীয়রা পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতি সময় ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য ততদিনে বাঙালিদের মানসিকতারও পরিবর্তনও এসেছিল। কেননা ইতিমধ্যে মধুসূদন গুপ্ত, রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার[২৫], কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং হৈমবতী সেন[২৬]-দের মতো বাঙালিরাও 'পশ্চিমী' বা 'এলোপ্যাথি' চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করে স্বনামধন্য চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করছিলেন। এছাড়াও বাঙালিরা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের সহকারী (assistant) হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে উঠছেন।[২৭] এর পাশাপাশি ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা। কিন্তু তা আলোচ্য জেলায় খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।[২৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতো ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলাতেও প্রাথমিক ভাবে ব্রিটিশদের জনস্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়িত হয়েছিল কেবলমাত্র ভারতে থাকা ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী এবং ইউরোপীয় কর্মচারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। তবে পরবর্তীকালে যাতে ভারতীয়দের রোগ-মহামারী থেকে ব্রিটিশদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেইজন্য ভারতীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশরা উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনার ফলে ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলা তথা ঔপনিবেশিক বাংলার ঐতিহ্যশালী আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেশীয়

চিকিৎসা পদ্ধতি দুটি এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় সংগ্রহ করে নিজেদের আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছিল। তা সত্ত্বেও, এলোপ্যাথির তুলনায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির দাপট ছিল অনেক বেশি। কেননা, এলোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা নদিয়া তথা ঔপনিবেশিক বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথি ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রচলিত হলেও আলোচ্য জেলায় তার প্রভাব ছিল খুব সামান্য। এসব সত্ত্বেও বলা যায়, ব্রিটিশরা এলোপ্যাথি বা পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে 'সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার' (tools of empire) হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করেছিল।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. G.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot., 1910, P, 1.

২. তদেব, P. 2-3

৩. Biswamoy Pati and Mark Harrison, (eds.), *The Social History of Health and Medicine in Colonial India*, New York : Routledge, 2009, P. 2-3.

৪. Edwin Chadwick-এর মতো অতি-স্যানিটারিয়ানরা নোংরা, আবর্জনা, জঞ্জাল ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশকে রোগ, মহামারীর জন্য দায়ী করেছেন। তাঁদের এই ধারণাটি 'পরিসর বিষয়ক' (Spatial)।

৫. একদল সমাজতান্ত্রিক বিষয়টি প্রচলন করেছিলেন। বিষয়টি মূলত সময় সম্পর্কিত।

৬. বিশদে জানতে দেখুন, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বায়ো-মেডিসিন থেকে নজরদারী মেডিসিন : ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, ফুকো এবং তারপর, কলকাতা, অবভাস, ২০০৮।

৭. মহামারী নির্মাণের পুরো ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে অরবিন্দ সামন্ত, রোগ রোগী রাষ্ট্র : উনিশ শতকের বাংলা, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ১৫-১৭।

৮. Patrick Manson, *'The Need for Special Training in Tropical Diseases' in Journal of Tropical Medicine*, 2 (1899), P. 57-62.

৯. Thomas R. Metcalf, *Ideologies of the Raj*, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

১০. Biswamoy Pati and Mark Harrison, (eds.), op. cit. P. 7.

১১. বিশদে জানতে দেখুন, Keneeth Balhatch, *Sex, Race and Class under the Raj Inperial Attitudes and Policies and Their Critics*, 1793-1905, London : Weidenfeld and Nicolson, 1980.

১২. G.H.E. Garrett, op.cit. : W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. II, London : Trubner & Co., 1876.

১৩. *Report of the Bengal Drainage Committee*, Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1907.

১৪. G.H.E. Garrett, *op. cit.*

১৫. 'Germ Theory'র মূল কথা হল—বিভিন্ন ধরণের জীবাণুর ফলে বিভিন্ন রোগ-মহামারী সৃষ্টি হয়। বিশদে জানতে দেখুন, Robert P. Gaynes, *Germ Theory : Medical Pioneers in Infectious Diseases*, New York : ASM Press, 2011.

১৬. Deepak Kumar, Science Policy of the Raj, D. Phil. Thesis, University of Delhi, 1985, P. 185; Pratik Chakrabarty, Bactoriology in British India : Laboratory Medicine and the Tropics, Boydell & Bruer,

2017 (Reprint Edition).

১৭. অরবিন্দ সামন্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩০।

১৮. G.H.E. Garrett, *op. cit.* P. 57-59.

১৯. *ibid*, P. 61-62.

২০. বিশদে জানতে দেখুন, D. R. Headrick, Tools of Empire : Technology and European Imperialism in Nineteenth Century, New York, Oxford University Press, 1981.

২১. G.H.E. Garrett, *op. cit.* P. 145-146.

২২. *ibid*, P. 146-147.

২৩. বিশদে জানতে দেখুন, সুব্রত পাহাড়ী, উনিশ শতকে বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৭; বিনয়ভূষণ চৌধুরী, উনিশ শতকে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫, বিনয়ভূষণ চৌধুরী, উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসাব্যবস্থা : দেশীয় ভেষজ ও সরকার, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮; Debiprasad Chottopadhaya, History of Science, Technology in Ancient India : The Beginning, New Delhi : South Asia Books, 1987; Dominik Wujastyk, *The Roots of Ayurveda*, Delhi, Penguin, 1998 Chittabrata Palit & Achintya Kumar Dutta (eds.), *History of Medicine in India : The Medical Encounter*, New Delhi : Kalpaz Publication, 2005; Farokh Erach Udwadia, *The Forgotten Art of Healing and Other Essays*, New Delhi : Oxford University Press, 2009; Syed Ezaj Hussain & Mohit Saha (eds.), *India's Indigenous Medical Systems : A Cross-Disciplinary Approach*, New Delhi : Primus Books, 2015; Poonam Bala (ed.), *Contesting Colonial Authority : Medicine and Indigenous Responses in Nineteenth and Twentieth India*, New Delhi, Primus Books, 2016; Projit Bihari Mukharji, *A Social History of Healing in India : De-centring Indigenous Medicine*, New York, Routledge, 2016.

২৪. বিশদে জানতে দেখুন, Guy Attewell, *Refiguring Unani Tibb : Phural Healing in Late Colonial India*, New York, Orient Blackswan, 2007, Jahan Ali Purkait, *Recasting Unani Medicine in Aliah Madrasah (1780-1947)*, Kolkata, Rupali, 2014; জাহান আলি পুরকাইত, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ইউনানী চিকিৎসার বিষয়-বৈচিত্র্য, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১৭।

২৫. বিনয়ভূষণ চৌধুরী, উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫; বারিদবরণ ঘোষ, বিজ্ঞান সাধক বাঙালি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭; অরূপরতন ভট্টাচার্য, উনিশ শতকে বাঙালির বিজ্ঞান ভাবনা ও সাধনা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪; রণতোষ চক্রবর্তী, বিস্তৃত প্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী, ২য় খণ্ড, আগরতলা, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ২০১৩।

২৬. Geraldine Forbes & Tapan Ray Chowdhuri, *From a Child Widow to a Lady Doctor : The Memories of Dr. Haimabati Sen*, New Delhi, Roli Books, 2000; চিত্রা দেব, মহিলা ডাক্তার ঃ ভিন গ্রহের বাসিন্দা, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৩।

২৭. আরও জানতে দেখুন, Dipa Sinha, *Women, Health and Public Services in India*, New York, Routledge, 2016; Sujata Mukherjee, *Gender, Medicine and Society in Colonial India : Women's Health Care in Nineteenth and Early Twentieth Century Bengal*, New Delhi, Oxford University Press, 2017; Ambalika

Guha, *Colonial Maternities : Midwifery in Bengal*, C. 1860-1947, New Delhi, Routledge India, 2017; Jharna Gourlay, *Piety, Profession and Sisterhood : Medical Women and Female Medical Education in Nineteenth Century India*, Kolkata, K.P. Bagchi & Co., 2017.

২৮. বিশদে জানতে দেখুন, Mahuya Duttaguptta, *Negotiating the Trajectory of a Merginal Medical Decipline : Homeopathy in Colonial Bengal*, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Burdwan, 2015; Shinjini Das, *Vernacular Medicine in Colonial India : Family, Market and Homoeopathy*, London, Cambridge University Press, 2019.

পলাশ দে
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
ধূলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

শান্তিপুরের রাস বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলনক্ষেত্র

অভিষেক প্রামাণিক

শান্তিপুর বাংলার উৎসব নগরী, বারো মাসে তেরো পার্বণ বলার থেকে শান্তিপুরের ক্ষেত্রে 'প্রতিদিন পার্বণ' কথাটাই খাটে বেশি। বাংলার এমন কোনও উৎসব বা পার্বণ হয়তো নেই যা শান্তিপুরে পালিত হয় না। সে পৌষকালী বা বাহান্ন হাত কালীই হোক আর ব্রহ্মার পুজো বা অন্নপূর্ণা পুজোই হোক। শোনা যায় একসময় সূর্যপুজোও হত। তবে এখন তা আর নেই। শান্তিপুরে উৎসব-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে পালিত ও প্রচারিত রাসযাত্রা এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য। রাসের কথায় প্রথমেই বলা যেতে পারে 'রস' থেকে রাস। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর শরণে গিয়ে বলতে হয়—''রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ।'' রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের রস আস্বাদন-ই তো এক অর্থে রাস আর সেখানে গোপীরা সেই রাসের অংশভাগী। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড'-এ অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে নারদ যখন রাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন—

''বৃন্দাবনং কিস্প্রকারং কিংবিধং রাসমণ্ডলম্।
হরিরেকস্তাশ্চ বহ্ব্যঃ কেন ক্রীড়া বভুব হ।।''[১]

তারই উত্তরে জানা যায়, অসংখ্য পুষ্প, পক্ষী, কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি ও মনোহর উপাদানে ভরপুর স্থানই রাসের সুযোগ্য, আর সেখানে অসংখ্য গোপীসহ রাধার সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়াই রাস। এ সকল পৌরাণিক বর্ণনা আমাদের অনুভূতির জগতে পরম সৌন্দর্যের ভাব জাগরিত করে। যার সঙ্গে আমাদের আলোচনার প্রাথমিক পরিচয় একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ আমাদের আলোচ্য শান্তিপুরের রাসও রাধা-কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি রচনায় ভিন্ন নয়। তবে শান্তিপুরের রাসের ভিন্নতা তার সমন্বয়ে, পালনে, তার সামগ্রিকতায় ও বৈচিত্র্যে। যেখানে গড়ে ওঠে এক মানবিক মিলনক্ষেত্র।

'রাস' কথাটি বলতে বৈষ্ণবীয় ধারার কথাই সবার আগে মনে আসে। আর তা আসাও স্বাভাবিক। কারণ রাধা ও কৃষ্ণকে নিয়ে যে রাসযাত্রা তার সূত্র ভক্তি, প্রেম ও বৈষ্ণবীয় দর্শনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তত্ত্বগত দিক থেকে পৃথক হয়ে থাকে শান্তিপুরের রাস। শান্তিপুরের অতিপরিচিত বড় গোস্বামী বাড়িতেই প্রথম রাসের বিগ্রহের সূচনা বলে মনে করা হয়।[২] এছাড়াও মদনগোপাল বাড়ি, পাগলা গোস্বামী বাড়ি, উড়িয়া গোস্বামী বাড়ি প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বিগ্রহ মূর্তি রয়েছে তা সকলই রাধা ও কৃষ্ণের রাসলীলাবিষয়ক এবং তার সঙ্গে ভক্তির যোগ ওতপ্রোত। এই সকল বিগ্রহ-বাড়ির আলোচনায় আসার আগে উল্লেখ করতে হয় ভক্তির পাশাপাশি শক্তির সাধনার কথা, যা শান্তিপুরের রাসকে কেন্দ্র করে একই সঙ্গে হয়ে চলেছে। আসলে প্রচলিত কথা অনুযায়ী বলা যেতে পারে কালা আর কালীতে যে ভেদ নেই তারই প্রতীকী স্বরূপ যেন শান্তিপুরের রাসে ধরা দেয়। তাই এখানে রাসে শ্যামকালার সঙ্গে শ্যামাকালীর পুজো একই সঙ্গে হয়। বৈষ্ণব ভাবধারা ও শাক্ত ভাবধারার মধ্যে সম্প্রীতির অনন্য নজির এই উৎসব। রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে রাসেই ভজনা করা হয় 'রক্ষাকালী', 'শ্যামাকালী', 'ভদ্রাকালী', 'নটরাজ', 'পটেশ্বরী নারায়ণ', 'ত্রিপদ নারায়ণ', 'বীর হনুমান', 'ভারতমাতা', 'সন্তোষী' প্রভৃতি। এই বৈচিত্র্য শান্তিপুরের রাসকে অনন্য করে তুলেছে।

শান্তিপুরের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের যোগাযোগ বহু প্রাচীন, আর সেই সঙ্গে রাসেরও। রাসের সূচনার ইতিহাস সন্ধান করলে জানা যায়, মানসিংহের যশোর আক্রমণকালে অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশ গোস্বামী সকলের অনুরোধে যশোর রাজের বাড়ি থেকে গোবিন্দদেবের মূর্তিটি শান্তিপুরের বড় গোস্বামী বাড়িতে 'রাধারমণ' নামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি রাধিকার মূর্তিও সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহের মধ্যে দিয়ে শান্তিপুরে রাস

প্রামাণিক, অভিষেক : শান্তিপুরের রাস বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলনক্ষেত্র
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 31-34, ISSN 2249-4332

উৎসবের সূচনা হয়।[৩] সুতরাং শান্তিপুরের রাসের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের সম্পর্ক অতিপ্রাচীন। কিন্তু আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সময় তার গতিকে বাড়িয়ে বহু যুগ এগিয়ে এসেছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনা, বোধ, আদর্শ, বিচার সকলেরই বহু বদল হয়েছে। রাসও সেই পরিবর্তন থেকে পৃথক থাকেনি। তার উৎসব-আয়োজনের অবয়বে লেগেছে নতুন রঙ, নতুন ব্যাপ্তি, চাকচিক্য, সমারোহ আর মানুষের উদ্দীপনা। বর্তমানের ভোগবাদী সমাজ অজস্র বিকল্পের মধ্যে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। আর এই অভ্যাস মানসপটের মাধ্যমে যে তার সকল ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশেই লক্ষ করা যায় তার প্রমাণ অসংখ্য। রাসের ক্ষেত্রেও সেকথা আংশিক সঠিক হতে পারে বলে ধরাই যায়। তবে এসবের বাইরে গিয়ে এ রাস পরিণত হয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মিলনভূমিতে। তাই মথুরেশ গোস্বামীর হাত ধরে শান্তিপুরের রাসের যে সূচনা তার উৎসবে মিশে যায় ভিন্নতা, আড়ম্বর, আবেগ, নতুন ভাবধারা। ভিন্ন মত, ভিন্ন দর্শন, ভিন্ন রীতি মেনে শান্তিপুরে বৈষ্ণব ও শাক্ত রাসে কোনও তুলনা চলেনা, কোনও বিরোধ স্থান পায় না, বরং তাদের সহাবস্থান বর্তমানে একে অপরের পরিপূরক রূপে। উৎসবের ঔজ্জ্বল্য, আমেজ, জাঁকজমক এসবকে ধরে রাখতে ও তার প্রচার ও প্রসারে যেন এই মিলনের প্রয়োজনও ছিল।

বড় গোস্বামী বাড়ির রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন মঞ্চ

শান্তিপুরে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের সংখ্যা প্রায় ৩৭টি। আর প্রতিটি বিগ্রহের বিশিষ্ট নাম আছে। যদিও কখনও কখনও বিগ্রহের নামের মধ্যে সদৃশ লক্ষ করা যায়। বিগ্রহ মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল—বড় গোস্বামী বাড়ির 'শ্রীরাধারমণ জীউ', পাগলা গোস্বামী বাড়ির 'শ্রীকৃষ্ণরাই ও কেশবরাই জীউ', হাটখোলা গোস্বামী বাড়ির 'শ্রীগোকুলচাঁদ জীউ', আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ির 'শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ', চাকফেরা গোস্বামী বাড়ির 'শ্রীরাধাবল্লভ জীউ', মদনগোপাল বাড়ির 'মদনগোপাল জীউ', গোপালপুর সাহা বাড়ির 'শ্রীরাধাকান্ত জীউ', খাঁ বাড়ির 'শ্রীগোপীকান্ত জীউ', শ্যামচাঁদ মন্দিরের 'শ্রীশ্যামচাঁদ জীউ', বল্লভী আচার্য পাড়া বারোয়ারির 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীউ', আশানন্দ বাড়ির 'রাধাবল্লভ জীউ', ফটক পাড়ার 'শ্রীকালাচাঁদ জীউ', কাঁসারি পাড়ার 'শ্রীবংশীধারি জীউ', উড়িয়া গোস্বামী পাড়ার 'শ্রীমদনমোহন জীউ', গোস্বামী ভট্টাচার্য লেনের 'শ্রীবিশ্বমোহন জীউ', নতুন পাড়ার 'শ্রীজ্যাঠা গোপীনাথ জীউ', চৌগাছা পাড়া প্রামাণিক বাড়ির 'শ্রীকেষ্টরাই জীউ', পুঁটোপুঁটিতলা বারোয়ারির 'শ্রীপুঁটোপুঁটি জীউ', কাঁসারি পাড়ার 'শ্রীবঙ্কুবিহারি জীউ', শ্যামচাঁদ রোডের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণগোপাল জীউ', শর্মা বাড়ির 'শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ', ডাকঘর মোড়ের 'শ্রীপ্রাণবল্লভ জীউ', কুঠির পাড়ার 'শ্রীনন্দদুলাল জীউ', চৌগাছা পাড়ার 'শ্রীরসরাজ জীউ', দত্ত পাড়ার 'শ্রীগৌরহরি বিগ্রহ', চাঁদনি পাড়ার 'শ্রীভীষ্মমোহন জীউ' প্রভৃতি। এই সকল বিগ্রহগুলির নামের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আর তাঁদের ভজনার স্থান যে সবই কোনও না কোনও গোস্বামী বাড়ি এমনটি নয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব দর্শন

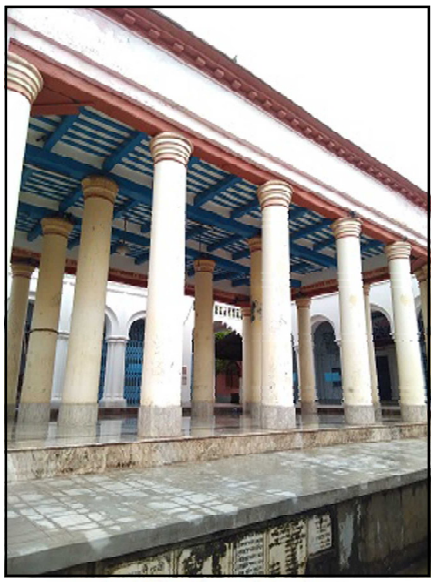
বড় গোস্বামী বাড়ির নাট মন্দির

শান্তিপুরের রাসে এসে ভিন্ন মাত্রা ও বিস্তার লাভ করেছে আপন পরিমণ্ডলের মধ্যেই। যেখানে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি বিগ্রহ রূপে বারোয়ারিতেও পূজিত হন, যেমন পুঁটোপুঁটিতলা। সুতরাং বলা যেতে পারে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি তার নানা রূপে শান্তিপুরের রাসে প্রকাশিত। আর তারই সূত্র ধরে মানুষের মনের প্রসারতায় ও আধুনিক যুগের পরিসরে রাস-উৎসবের আঙিনায় শাক্ত ভজনা ও পুজো একই সঙ্গে হয়ে চলেছে এবং সে ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই।

আটচালা শ্যামচাঁদ মন্দির

শান্তিপুরের রাসে শাক্ত ভাবের আরাধনা ও অনুষ্ঠান আয়োজনের গণনা বর্তমানে সংখ্যা দিয়ে করা সম্ভব নয়। কারণ সমগ্র শহরের পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, বারোয়ারিতে তা পালন করা হয়। সেখানে কোনও বৈষ্ণব ধারার মূর্তি নয়, একেবারে শাক্ত দেবদেবীদের ভজনার ভিড়। যদিও আজকাল এইসকল ক্ষেত্রে প্যাণ্ডেল, মূর্তি, শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজনের ঠেলায় এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখন আমাদের আলোচনার বিষয়ে ফিরে বলতে হয়, শাক্ত পুজোর বৈশিষ্ট্যের কথায়। প্রথমেই বলতে হয় শান্তিপুরের রাসে শাক্ত মূর্তির মধ্যে প্রধান হল কালী; তবে তার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কারণ 'ডাকাতে কালী' শান্তিপুরের নিজস্ব সৃজন, আর তার সঙ্গে পটেশ্বরী ও ভদ্রাকালীও আছে। ডাকাতে কালীর মূর্তির বিশেষত্ব তার আকারে কালো রঙের অবয়ব এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাঁ করা ভঙ্গিযুক্ত। অন্যদিকে ভদ্রাকালী দুইহাত বিশিষ্ট এবং কালীর মূর্তিটি বীর হনুমানের মাথার ওপর দণ্ডায়মান তারই সঙ্গে হনুমানের দুই হাতে রাম ও লক্ষ্মণ। এই ভদ্রাকালী পূজিত হন শান্তিপুর স্টেশন সংলগ্ন ভদ্রাকালী মোড়ে। আর পটেশ্বরী পটে আঁকা কালীর চিত্র, যেখানে কালীর সঙ্গে থাকে ডাকিনী ও যোগিনীর মূর্তি। পটেশ্বরীর পুজো প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন বলে মনে করা হয়।

শান্তিপুরের রাসে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলনের ও সমন্বয়ের অন্যতম উদাহরণ হল পুঁটোপুঁটিতলা বারোয়ারির আয়োজন। এই স্থানের বিগ্রহের প্রথম অবস্থান ছিল জগন্নাথ মন্দির পরবর্তীতে সেবায়ত পুরোহিত অসুস্থ হলে বিগ্রহটি পুঁটোপুঁটিতলা বারোয়ারিতে স্থাপিত হয়। আর রাসের সময় একই সঙ্গে এই বারোয়ারিতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে কালী ও যজ্ঞেশ্বর শিবের পুজো হয়ে আসছে। রাসে শাক্ত ঘরানার পুজোর মধ্যে যে বৈচিত্র্য তারই আরও এক নিদর্শন বড়বাজার অঞ্চলের সন্তোষী মাতার মূর্তি। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতা চিত্রের কথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা, শান্তিপুরের রাসে সেই ভারতমাতা পুজোর আয়োজনও হয় ন্যাড়া সান্যাল মোড়ে, দেবী মূর্তির সঙ্গে থাকে সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি। কাঁসারি পাড়ায় ষড়ভুজ মহাপ্রভু এক বিশেষ মূর্তি; এই মূর্তিতে রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্য তিনজনের মিলিত অবস্থান এবং তাঁদের মোট ছয়টি হাত। শান্তিপুরের বেজ পাড়া অঞ্চলে রাস উপলক্ষে পূজিত হন কমলে কামিনী, যে দেবীর কথা আমরা মঙ্গলকাব্যে পড়েছি তারই মূর্তি গড়ে এই অঞ্চলে রাসের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি শান্তিপুর স্টেশনে পূজিত অনন্ত শয্যায় নারায়ণ যা প্রচলিত রাসের আয়োজন প্রণালীর থেকে একেবারেই পৃথক দৃষ্টান্ত। বলী রাজার পৌরাণিক কাহিনির মৃণ্ময়রূপ

পটেশ্বরী বারোয়ারি

শান্তিপুরের রাসে 'ত্রিপদ নারায়ণ' নামে পূজিত হন। আর নটরাজ মূর্তির সংখ্যা অসংখ্য, প্রায় ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা রাস উপলক্ষে নটরাজের মূর্তির পুজোর ব্যবস্থা করে। বিগ্রহ বাড়ি ছাড়া প্রায় দু'শ বারোয়ারিতে রাস পালন করা হয় এবং প্রতিটি বারোয়ারির ব্যবস্থাপনার মৌলিকত্বের ছাপ স্পষ্ট রূপে ধরা দেয়।

ভাগবত থেকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৈষ্ণবীয় নানান গ্রন্থে রাসের যে সুললিত বর্ণনা তার সঙ্গে প্রেম ও ভক্তির যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। শান্তিপুরের রাস-উৎসবে তার বহু প্রাচীন সূচনা ও ইতিহাস নিহিত। বিগ্রহ মূর্তিগুলি সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে এই উৎসবের প্রচার ও প্রসার ক্রমে বেড়েই চলেছে। তবে এই বৃদ্ধিতে বৈষ্ণবীয় স্পর্শ যেমন আছে তেমনই আছে শাক্তের ছোঁয়া। তাই তো নবীনতার আলোকে শান্তিপুরের রাসে ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণব দর্শনের আয়োজনের পাশাপাশি বয়ে চলেছে শাক্ত ভজনা। একুশ শতকে এসে বিশ্বব্যাপী অতিসহজ যোগাযোগের ধারায় মনের, ভাবের, দর্শনের, ধর্মীয় রীতির যোগাযোগও যে সৌন্দর্য্যের মোড়কে ধরা দেয় শান্তিপুরের রাস সেই মিলনকেই, মিলনের বার্তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। মিলনের পরম রূপেই রাধারমণ ও ভদ্রাকালী, রাধাবল্লভ ও ডাকাতে কালী, কালাচাঁদ ও রাস কালী, নটরাজ ও ষড়ভুজ একসঙ্গে একই উৎসবে শান্তিপুরে পূজিত হন। আর এখানেই গড়ে ওঠে সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে অসংখ্য মানুষের মিলনক্ষেত্র, যেখানে সৃজিত হয় বৈষ্ণব ও শাক্তের ভাবের ঐক্য।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু. ও সম্পা.), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাম্, কলকাতা ঃ নবভারত পাবলিশার্স, পৃ. ৩৯৩।

২. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, শান্তিপুরের রাস, (দ্র.) শশাংক চক্রবর্তী (সম্পা.), শান্তিপুর বিগ্রহবাড়ি সমন্বয় সমিতি রাসোৎসব, শান্তিপুর, ২০১৬, পৃ. ৬৫।

৩. কল্যাণী নাগ, শান্তিপুর প্রসঙ্গ, কলকাতা ঃ পি এম বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ৫৭।

অভিষেক প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়,
ধূলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

‘পাতাল-কন্যা মণিমালা’ : গল্প ও শৈলীবিচার

অর্ঘ্য হালদার

বাংলা লোকসাহিত্যের ধারার ‘লোক-কথা’র অন্যতম জনপ্রিয় শাখা ‘রূপকথা’। রূপকথাকার রূপকথায় পাঠক বা শ্রোতাকে পরিচিত দেশ-কাল-সমাজকে অতিক্রম করে অন্য এক কল্পলোকে নিয়ে যান। পাঠক বা শ্রোতা তখন কল্পনার ডানায় ভর করে কল্পলোকে ভেসে বেড়ান। ঘটনায় সম্পৃক্ত কাহিনীগুলি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হলেও নানা শাখা কাহিনী বা উপকাহিনী যুক্ত হয়। রূপকথাগুলি উদ্ভট, বাস্তবতাহীন, রোমাঞ্চকর, অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ হলেও এর অন্তর্নিহিত সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। ‘কোন কোন লোক-কথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মী, কল্পনার রাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করে থাকে, ইংরেজিতে Fairy tale বা বাংলায় রূপকথা বলা হয়।’[১] রূপকথাগুলি কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয় বা শিষ্ট লিখিত সাহিত্য নয়, যুগ যুগ ধরে মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক (Traditional) ধারা অনুসরণ করে মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা রূপকথাগুলি লিপিবদ্ধ হবার পর তার সাহিত্যিক আদর্শ বা Literary Standered তৈরি হয়। আর এর পাঠক বা শ্রোতা সাধারণত হয় শিশুরা। রূপকথার পাঠে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা জগতের অমল আলোয় তাদের অনুভবের জগৎকে স্পর্শ করে যায়। তারা সৎ রাজপুত্র বা রাজকন্যার দুঃখে সমব্যথী হয়ে উক্ত চরিত্রের সঙ্গে কল্পলোকে একাত্ম হয়ে যায়। তারা অপরিচিত জগৎ, অতিলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হয়, যা তাদের নিকট স্বপ্নাতীত। নানান কাল্পনিক ঘটনা শিশুমনকে নানান কল্পলোকের হাতছানি দেয়। তারা কল্পনায় বিভোর হয়ে বিস্ময়বোধ করে, যা তাদের কাছে ভালোলাগার এক জগৎ তৈরী করে।

পশুদের জবানীতে কথিত উপকথা ও নানান লোককাহিনী রূপকথার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভ্লাদিমির প্রপ লোককাহিনীর গঠন তত্ত্বে পশুদের জবানীতে কথিত ‘উপকথা’ ও কাল্পনিক উপাদানের সাথে পশু ও বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে ‘রূপকথা’র পার্থক্য করেন। বাংলা লোকসাহিত্যবিদ্ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—

> ‘‘বাঘ কুমীর, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, চড়ুই প্রভৃতি পশুপাখিকে নিয়ে প্রচলিত গল্পকে উপকথা বলে।’’[২]

কালক্রমে উপকথার স্থলে ধ্বনি প্রভাবে ‘রূপকথা’ শব্দটি বহুল প্রচার লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি গ্রহণযোগ্য—

> ‘‘রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখান থেকে সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়।’’[৩]

কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে লোককথার এক বিশেষ স্থান রয়েছে। ইউরোপে নবজাগরণের যুগে জোভান্নি ফ্রান্সেস্কো স্ত্রাপারোলা ও জিয়ামবাতিস্ত বাসিলেরা নানা লোককথা সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে লোককথা সংগ্রহ জার্মানীর দুই ভাই জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইলহেল্ম কার্ল গ্রীম বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় লোককথা সংগ্রহ করে ১৮১২ সালে প্রথম মুদ্রিত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[৪] (Brian Attebery, “The Fantasy Tradition in Mathew’s American Literature”, p. 5) আর রূপকথার স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত সাংগঠনিক ব্যাখ্যা দেন Vladimir Prop (১৮৯৫-১৯৭০) এর ‘Morphology of the Folklore’ (১৯২৮) গ্রন্থে। বাংলা সাহিত্যে

হালদার, অর্ঘ্য : ‘পাতাল-কন্যা মণিমালা’ : গল্প ও শৈলীবিচার
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 35-50, ISSN 2249-4332

প্রথম 'রূপকথা' শব্দটি ব্যবহার করেন সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) উপন্যাসে। তিনি উক্ত উপন্যাসে ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখ দিয়ে 'রূপকথা' শব্দটি বলিয়েছিলেন। আর বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক ছিলেন লালবিহারী দে (১৮২৪-১৯৯৪)। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রূপকথাগুলিকে সংগ্রহ করে ১৮৭৫ সালে ইংরেজি অনুবাদ করে 'Folk Tales of Bengal' নামে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাড্‌লিবার্ট 'Fairy Tales of Bengal' রূপকথার অপর একটি বই প্রকাশ করেন। ড. সুকুমার সেনের মতে উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটি কেবল বাংলা ভাষাতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর রূপকথার প্রথম গ্রন্থ। কারণ লোককথা সংগ্রহের পথিকৃৎ জার্মানীর দুই ভাই জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইলহেল্‌ম কার্ল গ্রীমের পূর্বে কেরি তাঁর সংগ্রহটি সমাপ্ত করেছিলেন।[৫]

বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারার বাংলা রূপকথার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক কিংবদন্তী পুরুষ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৬)। তিনি একাধারে ছিলেন, লোকসাহিত্য সংগ্রাহক, ছড়াকার, চিত্রশিল্পী, কিশোর কথাকার, পত্রিকা সম্পাদক—এককথায় বহুগুণের অধিকারী। তাঁর অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইলে জমিদারী দেখাশোনার পাশাপাশি পল্লিবাংলাকে জানার সুযোগ হয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মেঠো পথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সংগ্রহ করেন, অভিজাত ও লিখিত সাহিত্য থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ রূপকথা, লোককথা, গীতিকথাগুলি। ১৯০৭ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে সেকালের বিখ্যাত প্রকাশক 'ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স' থেকে প্রকাশ করেন বিখ্যাত রূপকথা 'ঠাকুরমার ঝুলি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> ''দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।''[৬]

আলোচ্য গল্পের উল্লেখযোগ্য একটি গল্প হল—'পাতাল কন্যা মণিমালা'। গল্পটি আলোচনার পূর্বে রূপকথার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া প্রয়োজন—

১) যে কোনো অসম্ভব ব্যাপার রূপকথায় গ্রাহ্য হবে। শ্রোতা বা পাঠকের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে না।
২) পশু-পাখি রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদি প্রাধান্য পেলেও তারা গল্পের নিয়ন্ত্রক হবে না।
৩) ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও প্রাচীন লোকবিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে।
৪) গল্পের বিষয়বস্তু কখনও জটিল হবে না, একটি সরলরেখার মতো গল্প অগ্রসর হবে। বিষয়ের দিক থেকে প্রেমের পর অদৃষ্ট বা নিয়তি গল্পের প্রধান অবলম্বন হবে।
৫) গল্পে থাকবে রোমান্স।
৬) কৌতুক রসের প্রাধান্য থাকবে না।
৭) পরিণতি বিয়োগান্তক হবে না। তবে খল চরিত্রের পতন ঘটবে।
৮) কোনো নীতি বা উপদেশ থাকবে না।
৯) রূপকথার ভাষা হবে কাব্যধর্মী—এই ভাষা গীতি ও গদ্যের মধ্যবর্তী রেখা ধরে অগ্রসর হবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আলোচ্য গল্পটি লোককথা হিসেবে কতটা সার্থক তা দেখার চেষ্টা করব।

অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা ও প্রশ্নহীনতা

'পাতাল-কন্যা মণিমালার' গল্পেও অজগর সাপ কর্তৃক আস্ত দু'টো ঘোড়াকে গিলে ফেলা, সাপের মণির প্রসঙ্গ, 'এক খাবল কাদা' দিয়ে মণি ঢেকে দেওয়া, পাতাল পুরীর মধ্যে 'পরম সুন্দর অট্টালিকা'র অবস্থান, পাতালপুরী মধ্যস্থ অট্টালিকার মধ্যে 'লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা'র নিশ্চিন্তে ঘুমানো, মণিমালার মাথায় মণি স্পর্শ করায় জেগে ওঠা,

রাজপুত্রকে পাতালপুরী মধ্যস্থ অট্টালিকার মধ্যে রেখে মন্ত্রীপুত্রের দেশে গমন। এই সমস্ত ঘটনা অবাস্তব, অসম্ভব, অলৌকিক বলে মনে হলেও পাঠকের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না।

আখ্যানধর্মিতা

গল্পে অজগর সাপ, ঘোড়া, বহুবিচিত্র কোটি কোটি সাপের উল্লেখ থাকলেও তারা রূপকথার নিয়মানুযায়ী গল্পের নিয়ন্ত্রক হয়নি। রাজকন্যা মণিমালার আখ্যান গল্পের নিয়ন্ত্রক হয়েছে।

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও প্রাচীন লোকবিশ্বাস

পাগল রাজপুত্রকে ভালো করতে পেঁচোর মা বুড়ী মণিমালাকে রাজপুত্রের নিকট আনতে পবনের নৌকায় উঠে বলে ওঠে—

''ঘ্যাঁঘর্ চরকা ঘ্যাঁঘর্
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না
পবনের দেশে যা।''

পবনের নৌকা মণিমালার দেশে গিয়ে সরোবরের নিকট সুতো কাটতে থাকে। মণিমালা তা দেখে বুড়ীকে একখানা শাড়ী বুনে দিতে বললে, বুড়ী মণিমালাকে একটি শাড়ী বুনে কড়ি চাইলে, মণিমালা কড়ির বদলে মণি দিতে উদ্যত হলে দুষ্টু বুড়ী 'খপ্ করে' মণিমালাকে ধরে পবনের নৌকায় উঠিয়ে ঐন্দ্রজালিক ছড়া কেটে রাজপুত্রের নিকট নিয়ে এসে রাজপুত্রকে ভালো করে তোলে।

বিষয়বস্তু : সরলরৈখিক এবং অদৃষ্ট বা নিয়তির প্রাধান্য

গল্পের আখ্যানের মধ্যে কোনও জটিলতা নেই, কারণ রূপকথার পাঠক হয়, সাধারণত শিশুরা। একটি সরলরেখার মতো আখ্যান অগ্রসর হয়েছে। রূপকথা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাজার নামহীনতা। 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' রূপকথাতেও গল্পকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র দেখিয়েছেন, নামহীন একটি রাজার পুত্র ও তার মন্ত্রী পুত্রের গল্প। উক্ত রাজার রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র দেশভ্রমণে গিয়ে পথভ্রান্ত হয়ে, পাহাড়ের নিকট পৌঁছালে তারা দেখেন, সন্ধ্যা নামে। রাত্রে তারা দেশে ফিরতে পারবে না উপলব্ধি করে মন্ত্রীপুত্র বলে, ''বন্ধু, পাহাড়-মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ, আইস, ঐ গাছের ডালে উঠিয়া কোনও রকমে রাতটা কাটাইয়া দিই।'' রাজপুত্রও গৃহে ফেরা অসম্ভব মনে করে বন্ধুর কথাটিকে সমর্থন করে তাদের ঘোড়া দু'টিকে সরোবরের পাশে বেঁধে রেখে তারা গাছের ডালের ওপর উঠে শুয়ে পড়লে, গভীর রাত্রে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে ঘুম থেকে জেগে তারা দেখেন, ''বনময় আলো!'' সেই আলোতে দেখে, ''আকাশ পাতাল গলা ঠেকাইয়া এক কাল-অজগর তাহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত গিলিয়া খাইতেছে। অজগরের মুখে ঘোড়া ছটফট করিতেছে!'' রূপকথার অপর এক বৈশিষ্ট্য হল—অলৌকিকতার পাশাপাশি পশুদের উপস্থিতি। উক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে ঘোড়া ও অজগরের উপস্থিতি। রূপকথার অন্য এক বৈশিষ্ট্য হল—অলৌকিকতা, তাও এখানে অজগর কর্তৃক ঘোড়া গিলে ফেলার মধ্য দিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন। অজগর বনের পোকা মাকড় খেতে খেতে অন্যদিকে চলে গেলে, বিস্ময়কর আলোক দেখে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে চুপি চুপি বলে, ''বন্ধু! ডরাইও না, ওই যে আলোটি সাত রাজার ধন ফণীর মণি, মণিটি নিতে হইবে।'' রাজপুত্র ভয় পেলেও মন্ত্রীপুত্র তার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুকৌশলে মণির ওপর কিছুটা কাদা দিয়ে তার উপর তলোয়ার উল্টো করে রেখে পুনরায় গাছে উঠে যায়। অজগর নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে মণিটি না দেখতে পেয়ে 'তলোয়ারের উপর ফটাফট ছোবল মারতে থাকেন। নির্বোধ অজগরের তলোয়ারের ধারে তার ফণায় রক্তের বান বয়ে যায় 'চোখে আগুনের হলকা, মুখে বিষের ঝলক অজগর পাগল' হয়ে যায়। অবশেষে সে আত্মাহুতি দেয়—''সারা বনের গাছ মুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গে, লেজের বাড়িতে সরোবরের জল শতখন হইয়া যায়। অবশেষে রাগে, দুঃখে অজগর নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া তরোয়ালে

মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া গেল।'' সকাল হলে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র গাছ থেকে নেমে অজগর মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কর্দমাক্ত মণিটি নিয়ে তারা সরোবরের জলে নামেন। মণি সঙ্গে দুই বন্ধু জলে নামামাত্র জল দুই ভাগ হয়ে শুকিয়ে যায়। শেষে মণির আলোতে দেখেন, ''পাতাল পুরি পর্যন্ত এক পথ।'' জলের মধ্যে খানিক দূরত্ব অতিক্রমের পর একটি পরম সুন্দর অট্টালিকা তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। গল্পকার অট্টালিকার বর্ণনায় বলেছেন, ''চারিদিকে ফুল-বাগান, ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি, লতায়, লতায়, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি। দুই বন্ধু অট্টালিকার মধ্যে গেলেন।'' অট্টালিকার শব্দে রাজপুত্র ভয় পেলে মন্ত্রীপুত্র তাকে আশ্বস্ত করে জানায়—''বন্ধু ডরাইও না, মণি কাছে থাকিতে ভয় নাই।'' তারা কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গিয়ে একটি ঘরে যান, সেখানে তারা দেখেন—''লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে।''

রাজপুত্রের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীপুত্র তার কৌতূহল নিরসনের জন্য জানায়—''বন্ধু, দেখ, পাতাল পুরীর পাতাল কন্যা।'' মন্ত্রীপুত্র পাতাল কন্যার মাথায় মণি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মণিমালা জেগে ওঠে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে—''আপনারা কে? এ যে কাল্ অজগরের পুরী। আপনারা কেমন করে এখানে আসলেন!'' মণিমালার বিস্ময়কর প্রশ্নের উত্তরে তাকে আশ্বস্ত করে মন্ত্রীপুত্র জানায়—''রাজকন্যা ভয় নাই; কাল-অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর।'' 'বরে'র কথা শুনে রাজপুত্র ও মণিমালা পরস্পরে লজ্জিত হয়। মন্ত্রীপুত্র দু'জনের মাল্যদানের জন্য মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের, আবার রাজপুত্রের গলার মালা মণিমালার গলায় পরিয়ে দিয়ে তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। তারা কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করার পর মন্ত্রীপুত্র তাদের জানান—''বন্ধু, আমরা তো এখানে সুখেই আছি, দেশে কি হইল কে জানে। আমি যাই, পঞ্চকটক দোলা-বাদ্য সকল নিয়া আসিয়া তোমাদিগকে বরণ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।'' মন্ত্রীপুত্র তাদের সম্মতি নিয়ে দেশে ফিরে যায়। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে বিদায় দিতে এসে পুনরায় সরোবরে মণি দেখতে পেয়ে মণিটি নিয়ে মণিমালার নিকট ফিরে যায়। মণিমালা যেহেতু পাতালের অধিবাসী, তাই পৃথিবী সম্পর্কে তার কোনো রকম ধারণা ছিল না। রাজপুত্র পৃথিবী সম্পর্কে নানারকম তথ্য জানালে, পৃথিবীর প্রতি তার কৌতূহল বেড়ে যায়। সে রাজপুত্রকে জানায়—''জন্মে কখনো পৃথিবী দেখিলাম না, পৃথিবী দেখিতে বড় সাধ।'' একদিন রাজপুত্র মধ্যাহ্নে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলে, পৃথিবী দেখার কৌতূহল নিরসনের জন্য, মণির সঙ্গে 'ক্ষার খৌল গামছা' নিয়ে সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠে, পৃথিবীর অপরূপা সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে বলে ওঠেন—''আহা! কি সুন্দর!'' মণিকে উজলে উঠতে বলে, সে সরোবরের জলে স্নান করবে বলে। মণিমালার কথামতো মণি উপরে উঠে সরোবরের মাঝে রাজহাঁসের থাক, শ্বেত পাথরের ঘাট ও ধবধবে সুন্দর ঘাট তৈরি হলে মণিমালা ধাপের উপর মণি রেখে ক্ষার খৌল সহযোগে গা-পা কচলাতে থাকেন।

মণিমালা যে সরোবরে স্নান করছিলেন, সেটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই স্থানের রাজপুত্র শিকারে এসে সরোবরে মণিমালাকে দেখে জলে ঝাঁপ দেয়। মণিমালা তাকে দেখে ভয় পেয়ে মণি নিয়ে সরোবরে জলে ডুব দেয়। রাজপুত্র উন্মাদের মতো হয়ে—'হায় হায়' বলে রাজপুরিতে ফিরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোককথার অপর বৈশিষ্ট্যই হল—কথার মধ্যে কথার অবতারণা করা। এখানেও গল্পকার কাঠকুড়ানী পেঁচোর মায়ের কথা আনেন। সে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চুপটি করে থাকে। রাজপুত্র রাজপুরীতে ফিরে উন্মাদের মতো আচরণ করলে তাকে সুস্থতার জন্য নানা ঔষধ দেওয়া হলেও সুস্থ না হওয়াতে পরিশেষে রাজা ঢেঁটরা দেয়—''রাজপুত্রকে যে ভাল করিতে পারিবে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।'' ঢেঁটরা কেউ স্পর্শ না করলেও শেষপর্যন্ত পেঁচোর মা খবর পেয়ে 'উঠে কি পড়ে আছাড়ি-বিছাড়ি সাত তারাড়াতাড়ি' এসে ঢেঁটরা ধরে। রাজার নিকট গিয়ে সে জানায়—''তা রাজামশাই, আমি তো ওষধ জানি। তা আমি বুড়ি হাবড়া মেয়ে মানুষ, তা আমার পেঁচোর সঙ্গে যদি রাজকন্যার বিয়ে দাও, তো রাজপুত্রকে ওষধ দি।'' রাজা ছেলেকে বাঁচাতে পেঁচোর মায়ের কথাতেই রাজি হয়ে যায়। রাজপুত্রকে বাঁচাতে বুড়ির অপূর্ব কৌশল তুলে ধরেছেন গল্পকার। সে একরাশ তুলা, এক রকা নিয়ে পবনের নায়ে উঠে মন্ত্র বলে—

''ঘ্যাঁঘর্ চরকা ঘাঁঘর্
রাজপুত্র পাগল!
হটর্ হটর্ পবনের না,
মণিমালার দেশে যা।''

পবনের নৌকাতে বুড়ি মণিমালার দেশে গিয়ে সরোবরের কিনারে বসে ঘ্যাঁঘর্ ঘ্যাঁঘর্ করে চরকা কাটতে থাকে। পাতাল পুরিতে রাজপুত্র দ্বিপ্রহরে ঘুমে মগ্ন তখন মণিমালা পুনরায় মণি নিয়ে সরোবরে এসে বুড়িকে চরকা কাটতে দেখে বুড়িকে বলে—''আমাকে একখানা শাড়ি বুনে দে।'' বুড়ি তার কথামতো একখানা শাড়ি বুনে তার থেকে কড়ি চায়। মণিমালা তাকে জানায়, তার কাছে কোনো কড়ি নেই তবে মণি আছে। বুড়ি মণিটা দিতে বলে। বুড়িকে মণিমালা কড়ি দিতে গেলে বুড়ি তাকে পবনের নৌকায় উঠিয়ে বলে—

''ঘ্যাঁঘর্ চরকা ঘ্যাঁঘর্
রাজপুত্র পাগল!
হটর্ হটর্ পবনের না,
রাজপুত্রের কাছে যা।''

বুড়ি তার বুদ্ধিদৃপ্ততায় কৌশল করে মণিমালাকে রাজপুরিতে দিয়ে, মণিটি লুকিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। মণিমালার উপস্থিতিতে রাজপুত্র সুস্থ হলে, রাজাপুত্রের সঙ্গে মণিমালার বিবাহ হবে ঠিক হয়। তবে মণিমালা জানায় তার এক বছর ব্রত। এক বছরের মধ্যে তার বিবাহ হবে না। মণিমালার কাহিনীর মধ্যদিয়ে গল্পকার দেখায় পৃথিবীর মানুষ জটিল। স্বার্থ ছাড়া চলে না। পাতাল পুরীতে সে সমস্ত নেই। পাতাল পুরীর কন্যা মণিমালাও যেন স্বল্প সময়ে পৃথিবীতে এসে বাঁচার কৌশল রপ্ত করে নেয়। তাই তার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ ঠিক হলে সে কিছুটা সময় চেয়ে নেবার জন্য মিথ্যে কথার প্রশয় নেয়। সে ব্রতের দোহায় দিয়ে বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে দেয়। ''আমার এক বৎসর পরে যা'হয় হইবে।'' পেঁচোর মা ও তার পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সমস্যা, তার পুত্র পাঁচ সাত বছর ধরে নিখোঁজ। বুড়ি তার ছেলেকে খোঁজার জন্য দেশে লোক পাঠায়।

অন্যদিকে মণিমালা ও মণির অনুপস্থিতিতে সাপেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠলে, নানা বিষধর সাপের দংশনে রাজপুত্র অচেতন হয়ে পড়ে। মন্ত্রীপুত্র দোলা চৌদলা পঞ্চকটক সহ সরোবরের পাড়ে এসে চিৎকার করে ''বন্ধু! বন্ধু! পথ দেখাও।'' ডেকে গেলেও, কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে পঞ্চকটক বনে রেখে বাইরে বের হয়। পথে কিছুদূর অতিক্রম করার পর পথের লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে—''কে গো তুমি কা'র বাছা, পেঁচোকে দেখিয়েছো? পেঁচো রাজার জামাই হইবে, পেঁচোর মা বুড়ী পেঁচোর খোঁজে পথে পথে ঘুরে।'' মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধি করে বলে—''হাঁ, হাঁ, আমি পেঁচোকে দেখিয়াছি, সে তো রাজত্ব রাজকন্যা পাইল কেন?'' মন্ত্রীপুত্র সমস্ত ঘটনার পাশাপাশি পেঁচোর রূপটিও সে কৌশলে জেনে নেয়। পরের দিন মন্ত্রীপুত্র পোশাক পরিবর্তন করে গালে মুখে কালি, গায়ে গায়ে ছেঁড়া কানি, বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, ''খক্ খক্ কাশি, খিল্ খিল্ হাসি, দুই হাতে দুই গাছের ডাল-পেঁচোর নাচে উঠান কাঁপে।'' বুড়ী ভুলক্রমে মন্ত্রীপুত্রকে নিজপুত্র ভেবে তার সন্তান বাৎসল্য ফুটে ওঠে। বলে—''এই তো আমার বাছা! —আহা আহা বুকের মানিক, কোথায় ছিলি ঘরে এলি?—আয় আয়, তোর জন্যে—

''রাজ-রাজিত্বি দুধের বাটী
রাজকন্যা পরিপাটী
সোনার দানা মোহর থান—
সাতরাজার ধন মণি খান—

তোরই জন্যে রেখেছি।'' ছেলে ফিরে আসার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পেঁচোর ছদ্মবেশি মন্ত্রীপুত্রকে মণিটি হস্তান্তর করে।

মণিটি হস্তগত করে মন্ত্রীপুত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। পরের দিন বুড়ী রাজাকে গিয়ে তার পুত্র ফিরে আসার খবরটি জানায়—''তা, রাজা মশাই, রাজকন্যা বাহির করো-পেঁচো আমার আইয়াছে। আহা আহা, পেঁচোর আমার যে রূপ,—রূপ নয় তো নূপ,—নূপের সঙ্গে নূপ ভেস্যে যায়।'' রাজা তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো তার কন্যার সঙ্গে বুড়ীর পুত্র পেঁচোর (ছদ্মবেশী মন্ত্রীপুত্রের) বিবাহ সম্পূর্ণ করে। মন্ত্রীপুত্র বাসরঘরে পূর্বে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা রাজকন্যাকে জানায়। রাজকন্যা সমস্ত ঘটনা শুনে মন্ত্রীপুত্রকে বলে—''আমার ভাই মণিমালাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।'' মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যার নিকট মণিমালার খবর পেয়ে রাজকন্যার হাত দিয়ে বুড়ির থেকে প্রাপ্ত মণিটি মণিমালার নিকট পৌঁছে দিয়ে তাকে বলা সমস্ত পর্ব ঘটনা তার নিকট জ্ঞাপন করতে বলে। মণিমালা চতুর্থদিনে সকালে রাজপুত্রকে বলেন—''রাজপুত্র আমার ব্রত শেষ হইয়াছে, আমি আজ বরণ-সাজে সাজিয়া নদীর জলে স্নান করিব। আমার সঙ্গে বাদ্য-ভাণ্ড দিও না, জন-জৌলিষ দিও না, কেবল এক পেঁচো আর রাজকন্যা যাইবেন।'' মণিমালার কথামতো, পেঁচোকে ও রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা বরণসাজে স্নান করতে যায় নদীর ঘাটে। জলে নেমেই মণিমালা মণিকে বলে—

''মণি আমার আমায় ভুলে কোথায় ছিলি?

''বুড়ীর থলে।''

''কোথায় এসে আবার মণি আমার পেলি?''

''পেঁচোর গলে।''

মণিমালা বলে—

''আজ তবে চল্ মণি, অগাধ জলে।''

মণিমালার কথাতেই মণির ঐশ্বরিক ক্ষমতাই নদীর জল দু'ফাক হয়ে যায়। এ মণিমালা সেই সুযোগে মন্ত্রীপুত্রকে ও রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তারা আদৃশ্য হয়ে যায়, রাজপুত্র, রাজা, রাণী মণিমালাদের অদৃশ্য হওয়াতে 'হায়! হায়!' করতে থাকে। গল্পকার বলেছেন—

''মাতা খুঁড়িয়া বুড়ী মরিল
রাজ্য ভরিয়া কান্না উঠিল।''

পাতালপুরীতে মণিমালা মণি নিয়ে ফিরলে রাজার দেহে প্রাণ সঞ্চার হলে রাজপুত্র চক্ষু মুছে উঠে বলেন। গল্পকার পরিশেষে জানিয়েছেন—''মণির আলো, মণির বাতি, ঢাক ঢোলে হাজার কাঠি, রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র, মণিমালা আর রাজকন্যাকে লইয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন। পাতালপুরীর সাপের রাজ্যের সকল সাপ বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল।''

তাই গল্পের কাহিনী কখনো জটিল হয়নি। এক সরল রেখার মতো গল্প অগ্রসর হয়েছে। মণিমালা-রাজপুত্রের মালাবদলের পর মন্ত্রীপুত্রের অনুপস্থিতিতে মণিমালার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে শেষে মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধিমত্তায় রাজপুত্র ও মণিমালার মিলন সম্পন্ন হয়েছে।

রোমান্সধর্মিতা

গল্পে রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীপুত্র, পাতাল পুরীর সুদৃশ্য অট্টালিকায় প্রবেশ করলে, রাজপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীপুত্র জানায়—''বন্ধু, দেখ, পাতাল পুরীর পাতালকন্যা।'' পাতাল কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্র তাকে দেখতে থাকেন। মন্ত্রীপুত্র মণিটি পাতালকন্যার কপালে স্পর্শ করাতেই মণিমালা জেগে উঠে ত্রস্ত হয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে মন্ত্রীপুত্র উত্তরে জানান—''রাজকন্যা ভয় নাই, কাল-অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর।'' রাজপুত্র ও মণিমালা দু'জনেই লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে। মন্ত্রীপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় ও রাজপুত্রের মালা মণিমালার গলায় দিয়ে তাদের মালাবদল সম্পন্ন করেন। এই অংশে সামান্য রোমান্সের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিণতি : মিলনান্তক

গল্পের পরিণতি বিয়োগান্তক হয়নি। রাজপুত্র ও মণিমালার মিলনের মধ্যদিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। খল চরিত্র পেঁচোর মা বুড়ির পক্ষে তার ছেলে পেঁচোকে পাওয়া হয়ে ওঠেনি।

নীতি বা উপদেশহীনতা

গল্পের মধ্যদিয়ে কোন নীতি বা উপদেশের বার্তা গল্পকার দেননি।

কাব্যধর্মী ভাষা

গল্পের ভাষা কতটা কাব্যধর্মী তা গল্পের শৈলী আলোচনার দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করব।

> ''জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানা প্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানা প্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।''[৭] (সাহিত্যের সামগ্রী : রবীন্দ্রনাথ)

এই সৃষ্টি করে তোলবার জন্য প্রয়োজন হয় কারুকার্যপূর্ণ ভাষার। আর ভাষার এই কারুকার্যতা নির্ভর করে যথাযথ শব্দ চয়নের উপর। যে সাহিত্যিক যত বেশি যথাযথ শব্দ চয়ন করতে পারে সেই সাহিত্যিক ততবেশি সমাদৃত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> ''...মা'র মুখের অমৃত—কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত, পরে কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে আবার যাহা শুনিতে শিশুর মত হইতে হইয়াছিল, সে সব ক্ষীণ বিচ্ছিন্ন কঙ্কালের উপর প্রায় এক যুগের শ্রমের ভূমিতে এই ফুল-মন্দির রচিত।''[৮]

এই থেকে উপলব্ধি হয়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আলোচ্য 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' নামক রূপকথাধর্মী গল্পটির মূল কাহিনীটি তাঁর মা অথবা কোনো বৃদ্ধার থেকে সংগ্রহ করে, মূল কাহিনীর কঙ্কালের উপর ভাষার প্রলেপ দিয়েছেন। আর শৈলী হল 'লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা / এবং অচেতনভাবে নিয়োজিত সেই সব ভাষাগত উপায়, যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন।''[৯] শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে শব্দের আটপৌঢ়ে পরিচিত পোশাকটি বয়ানের প্রযুক্তিতে কীভাবে নান্দনিক সাজে সাজ্জিত হয়ে ওঠেছে তার অন্বেষণই চেষ্টা করব 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' নামক রূপকথাধর্মী ছোটগল্পটির মধ্যে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic words)-র প্রয়োগ

যেসব শব্দ দিয়ে ধ্বনির বৈচিত্র্য অনুভব করা যায়, সাধারণত সেই শব্দগুলিই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ''বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া যায়।''[১০]

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সাহিত্যে 'সাংকেতিক দ্যোতনা বহন' করার পাশাপাশি 'শ্রুতির অতীত এক সংবেদন সৃষ্টি করে পাঠকের মনোভূমিতে, কবিতার মাধ্যমে গড়ে তোলেন বাক্‌প্রতিমা (Phono-aesthetic image)[১১] সাহিত্য রচনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের বিশেষ গুরুত্বের কথা প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী উলম্যানও উল্লেখ করেছেন—

> ''Onomatopocia, sound symbolism, phonaesthetic effects and kundred phenomena are part of the fabric of poetry and although a recent momograph has uttered a salutory warning against auto-suggestion and fanciful speculations, the remains one of the most active area of style-study.''[১২]

যে কোনো সাহিত্যিক তাঁর নানান উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে রচনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেন।

''প্রথমত, ধ্বনির সঙ্গে অনুভূতির এক অদৃশ্য মেলবন্ধন রয়েছে, কবিতা বা কাব্যে তা আরো বেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।...

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অর্থকে সরাসরি শ্রোতা / পাঠককে অনুভূতির দরবারে হাজির করতে পারে। ...

তৃতীয়ত, কবিতার আঙ্গিকের জন্যও ধ্বন্যাত্মক উপকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।..''[১৩] অধ্যাপক অপূর্ব কুমার রায় 'সাহিত্যের ধ্বনিগত' আলোচনায়, আধুনিক কালে, দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন—

ক) ধ্বনির অনুকারক শব্দ (Primary Onomatopocia)

খ) ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ (Secondary Onomatopocia)[১৪]

ক। ধ্বনির অনুকারক শব্দ (Primary Onomatopocia)

এ ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ নয়, পাঠকের শ্রুতির সঙ্গে তা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কান্বিত। বলাই বাহুল্য, প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি প্রায়শই গতিশীল চিত্রকল্প (Kinesthetic imagery) সৃষ্টির প্রয়োজনে রচনা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেবলমাত্র বাংলাভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ছড়াছড়ি তাই নয়, ইংরেজি ভাষাতেও যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন—

> ''ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে, যথা bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার সহিত তুলনায় তাহা সামান্য।''[১৫]

আলোচ্য 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' নামক রূপকথাধর্মী ছোটগল্পে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ধ্বনির অনুকারক শব্দ বা Primary Onomatopocia-র প্রয়োগের দ্বারা এক সংবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন পাঠকের মনোভূমিতে।

১) ক) অজগরের মুখে ঘোড়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!
ছট্‌ফট্‌ শব্দপ্রয়োগে গল্পকার বেদনাময় অস্থিরতা প্রকাশ করে এক ধরণের চিত্রকল্প আঁকতে চেয়েছেন।

খ) রাজপুত্র থর্‌ থর্‌ কাঁপেন!
থর্‌ থর্‌ প্রবল কম্পমান ভয়ার্ত অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন।

গ) সর্‌সর্‌ করিয়া গাছে উঠিয়া গেলেন।
সর্‌সর্‌ দ্রুতগতিবোধক, গতিশীল চিত্রকল্প (Kinesthetic imagery) আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ঘ) অজগর হোঁস্‌ হোঁস্‌ শোঁস্‌ শোঁস্‌ শব্দে ছুটিয়া আসিল।
হোঁস্‌ হোঁস্‌ শোঁস্‌ শোঁস্‌ ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে গতিশীল চিত্রকল্প আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ঙ) থর্‌ থর্‌ করিয়া দুই বন্ধুর রাত পোহাইল।
থর্‌ থর্‌ প্রবল কম্পমান ভয়ার্ত অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন।

চ) 'লকলকে' 'চকচকে' কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গাইয়া সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন।
'লকলকে' নমনীয় পদার্থের প্রসারণতা প্রকাশ করেছেন।
'চকচকে' সাপেদের ঔজ্জ্বলতা, দীপ্তির প্রকাশ।

ছ) সরোবরের মাঝখানে রাঁজহাঁসের থাক, শ্বেতপাথরের ধাপ, ধব্‌ধবে সুন্দর ঘাটলা হইল।
অতিশয় শুভ্রতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাব। অতিশয় শুভ্র ও উজ্জ্বল।

জ) ঘ্যাঁঘর্‌ চরকা ঘ্যাঁঘর্‌ / রাজপুত্র পাগল!

চরকা ঘোরার গতিশীল চিত্রকল্প পরিস্ফুট।

ঝ) হটর্ হটর্ পবনের না, / মণিমালার দেশে যা।
'হটর্ হটর্' শ্রুতিগ্রাহ্য গতিময়তার প্রয়াস। আসলে রূপকথার গল্পে কাহিনী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টা।

ঞ) বুড়ি সরোবরের কিনারে বসিয়া ঘ্যাঁঘর্ ঘ্যাঁঘর্ করিয়া চরকায় সুতা কাটিতে লাগিল।
'চরকা ঘোরা' গতিশীল চিত্রকল্প পরিস্ফুট।

ট) অট্টালিকার মধ্যে সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ শব্দ।
সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ শব্দের মধ্যে গতিশীল চিত্রকল্প। সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ শব্দগুলির মধ্যে কোনো অর্থ নেই। ফলে পাঠক অর্থের মাধ্যমে না এসে সরাসরি শ্রুতান্দ্রিয়ের মাধ্যমে কল্পনায় অট্টালিকার মধ্যে এসে পৌঁছে অট্টালিকা সম্বন্ধে উপলব্ধি করা সহজ হয়েছে।

ঠ) আহ্লাদে আটখানা বুড়ী গুড়ুসুড়ু মণিটি বাহির করিয়া চুপি চুপি পেঁচোর হাতে দিল।
গুড়ুসুড়ু মণির সঙ্গে মণির কোনও সম্বন্ধ পাওয়া না গেলেও এই জাতীয় শব্দ যে, বিশেষ বাক্প্রতিমা সৃষ্টি করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ড) শিয়রের সাপ গুড়িসুড়ি, গায়ের সাপ ছাড়াছাড়ি।
এখানে 'গুড়িসুড়ি' ও 'ছাড়াছাড়ি' ধ্বন্যাত্মক শব্দে অন্ত্যমিল তৈরী হয়েছে। এই সমস্ত অন্তমিল তৈরি করে অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি গতিশীল চিত্রকল্প (Kinesthetic imagery) নির্মিত হয়েছে।

খ) অপ্রধানধ্বনিবৃত্তি বা ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ (Secondary Onomatopocia)

অপ্রধানধ্বনিবৃত্তি বা ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দগুলি ধ্বনির ঠিক অনুকারক নয়, ভাবের প্রকাশক। এক্ষেত্রে শ্রুতিকে অতিক্রম করে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগ হয়ে ওঠে সংকেতের মতো।[১৬] রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন—

> ''ধ্বনির সহিত যে-সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন— কনকনে শীত, কনকনে ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।''[১৭]

ক) পরদিন বুড়ী আউল চুলের ঝাঁটি বাঁধিয়া, নাড়ি ঠক্ঠক্, রাজার কাছে গেলেন।
'ঠক্ঠক্' সাধারণত কঠিন বস্তু ঠোকার বা তার সঙ্গে আওয়াজকে বোঝায়। পেঁচোর মা যে, রাজার নিকট এসে পৌঁছেছেন, সেই বার্তা দিতেই হয়তো গল্পকার 'ঠক্ঠক্' ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে বিশেষ বাক্প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন।

খ) শিয়রের সাপ গুড়িসুড়ি, গায়ের সাপ ছাড়াছাড়ি।
এখানে 'গুড়িসুড়ি' ও 'ছাড়াছাড়ি' ধ্বন্যাত্মক শব্দে অন্ত্যমিল তৈরী হয়েছে। এই সমস্ত অন্তমিল তৈরি করে অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করেছেন।

গ) কাল অজগর পাগল হইয়াছে—সারা বনের গাছ মুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গে।
সাধারণত হালকা বা মৃদু অর্থে 'মুড়মুড়' শব্দ ব্যবহৃত হয় (যেমন—'মুড়মুড়' করে পাপর চিবোনো) কিন্তু এখানে 'মুড়মুড়' ক্রিয়াবিশেষাত্মক ধ্বন্যাত্মক শব্দটি হালকা বা মৃদু অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে গল্পকার 'শক্ত কঠিন গাছ সমষ্টিকে ভাঙ্গার আওয়াজ হিসেবে ব্যবহৃত করে' সাপের অপূর্ব শক্তির প্রদর্শন দেখিয়েছেন।

ঘ) পরদিন বুড়ী আউল চুলের ঝুঁটি বাঁধিয়া, নড়ি ঠক্ঠক্, রাজার কাছে গেলেন।

'ঠক্‌ঠক্' সাধারণত কঠিন বস্তু ঠোকার বা তার সঙ্গে আওয়াজকে বোঝায়। পেঁচোর মা যে, রাজার নিকট এসে পৌঁছেছেন, সেই বার্তা দিতেই হয়তো গল্পকার 'ঠক্‌ঠক্' ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে বিশেষ বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন।

ঙ) খক্ খক্ কাশি, খিল্ খিল্ হাসি, দুই হাতে দুই গাছের ডাল-পেঁচোর নাচে উঠোন কাঁপে।

মন্ত্রীপুত্রের ছদ্মবেশী পেঁচোর রূপধারণে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ বোঝাতে 'খক্ খক্' কাশি, 'খিল্ খিল' হাসি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। 'খক্ খক্' কাশি ও 'খিল্ খিল্' হাসি স্থির দৃশ্যময় নান্দনিকতাকে আহ্বান জানায়। 'খক্ খক্' ও খিল্ খিল্' শ্রুতিগ্রাহ্য অনুভূতির সূচক। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে (কাশি ও হাসি)র মধ্যদিয়ে এখানে অন্তমিলও ঘটেছে। যেন বুড়ীর হারিয়ে যাওয়া পেঁচোও ফিরে আসা পেঁচোর খক্ খক্ কাশি, খিল্ খিল্ হাসির মধ্যদিয়ে, বুড়ী ও পেঁচোর যেন মিল ঘটেছে। আসলে গল্পকার এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে মিলেরও চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

তাই, আলোচ্য গল্পে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি কেবলমাত্র ধ্বনির অনুকারক নয়, যথাযথ ভাবেরও প্রকাশক।

অধিবাচন (Discuourse)

অধিবাচন (Discourse) হল—"A unit of linguistic performance which stands complete in itself is commnly called a discourse." (Chapman 1989 : 100). 'ভাষাপ্রয়োগের স্বয়ংসম্পূর্ণ একককে বলা যেতে পারে সন্দর্ভ / অধিবাচন।'[১৮]

অধিবাচন (Discourse) এর কয়েকটি বিভাগ হল—

অ) বর্ণনাকেন্দ্রিক অধিবাচন (narative discourse)

আ) সংলাপকেন্দ্রিক অধিবাচন (dialouge-oriented discourse)

ই) অন্তরঙ্গ অধিবাচন (projective discourse)

ঈ) কথনমূলক অধিবাচন (oratory discourse)

উ) সাংগীতিক অধিবাচন (musical discourse)

আলোচ্য রূপকথার গল্পে আমরা তিন ধরণের (বর্ণনাকেন্দ্রিক, সংলাপকেন্দ্রিক, অন্তরঙ্গ) অধিবাচন (Discourse) লক্ষ্য করি।

অ) বর্ণনাকেন্দ্রিক অধিবাচন (narative discourse)

বর্ণনাকেন্দ্রিক অধিবাচনে আখ্যান রচয়িতা বর্ণনার মধ্যদিয়ে পাঠকের সামনে দৃশ্য ও শব্দময় জগতের ছবি তুলে ধরেন। 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' রূপকথাতে বর্ণনা অংশে এখানেও রূপকথাকার সর্বজ্ঞ হয়ে কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন—''এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রীপুত্র—দুই বন্ধুতে দেশভ্রমণে গিয়াছেন। যাইতে যাইতে এক পাহাড়ের কাছে গিয়া ... সন্ধ্যা হইল!'' তিনি সমস্ত কিছু জানেন, এমন বর্ণনা কৌশল প্রথম পুরুষে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি আলোচ্য গল্পের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য রূপকথার গল্পে গল্পকার বর্ণনাকেন্দ্রিক অধিবাচন সাধুভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমন—

ঘ) ''অনেক রাত্রে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কি-জানি কিসের এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন—বনময় আলো! —সেই আলোতে ওরে বাপরে বাপ! রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের গা-অঙ্গ ডোল হইল, গায়ে গায়ে কাঁটা দিল, দেখেন, আকাশ পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক—অজগর তাহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত আস্ত গিলিয়া খাইতেছে। অজগরের মুখে ঘোড়া ছটফট করিতেছে!''

ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলী (Verbal Style)

অত্যাধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারে প্রবণতা থেকে তৈরি হয় ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলী।[১৯] আলোচ্য রূপকথার গল্পে ক্রিয়াশ্রিত শৈলীর বহুল প্রয়োগ সমস্ত গল্প জুড়েই লক্ষ্য করা যায়।

ক) দেখিতে দেখিতে ঘোড়া দুইটাকে গিলিয়া, যতদূর আলোতে দেখা যায়, অজগর বনের পোকা-মাকড় খাইতে খাইতে ততদূর বেড়াইতে লাগিল।

খ) বলিয়া, মন্ত্রীপুত্র, আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়াই এক খাবল কাদা আনিয়া মণির উপর ফেলিয়া দিলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনামূলক অধিবাচনে (narrative discourse) দু'টি দীর্ঘ বাক্যের প্রথম দৃষ্টান্তে একটি বাক্যের মধ্যে একাধিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে পাঁচটি (দেখিতে দেখিতে, গিলেফেলা, আলোতে দেখা, পোকা-মাকড় খাওয়া, বেড়াইতে লাগা) কাজের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও একটি বাক্যের মধ্যে একাধিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে পাঁচটি (বলা, আস্তে আস্তে নামা, আসা, কাদা আনা, মণির উপর ফেলে দেওয়া) কাজের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি বাক্যের প্রারম্ভ হয়েছে অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে। একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগে বাক্যকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত রূপকথার আখ্যানে পাঠককে কল্পনার ডানায় ভয় করে ভেসে বেড়াতে হয়। এখানেও যেন একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগে দীর্ঘায়িত বাক্যের ধীরলয়ের ছন্দের গতিময়তা মিলে যায়। আসলে দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগে কাহিনীর গতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলে। এইরকম একাধিক ক্রিয়াশ্রিত শৈলীর মাধ্যমে Metaphor (উপমা) দিকে এগিয়ে যায়, আলোচ্য গল্পে এইরকম প্রতুল দৃষ্টান্ত মেলে। ক্রিয়া-প্রয়োগের অপর একটি বিশেষত্ব হল, অধিবাচনিক সংলগ্নতায় (Cohesion) নির্মাণ। অনেক সময় একটি অনুচ্ছেদের সমাপ্তি যে ক্রিয়ায়, পরের অনুচ্ছেদে সেই ক্রিয়া দিয়ে সূচনা। এই রকম দৃষ্টান্ত আলোচ্য গল্পে পাওয়া যায়—

ক) ... তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন। নামিতে নামিতে দুই বন্ধু যতদূর যান...।

আ) সংলাপকেন্দ্রিক অধিবাচন

রূপকথার প্রত্যেকটি চরিত্রের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য চরিত্রের সংলাপের আশ্রয় নেন রূপকথাকার। আলোচ্য গল্পে মন্ত্রীপুত্র বলেন, ''বন্ধু। ডরাইও না, ওই যে আলো, ওটি সাত রাজার ধন ফণীর মণি,—মণিটি নিতে হইবে।''

এই সংলাপ অংশের মধ্যদিয়ে গল্পকার মন্ত্রী পুত্রের সাহসিকতার পরিচয় ও রাজপুত্রকে ভয় থেকে সাহস জোগানোর পরিচয় পাঠকদের নিকট পরিস্ফুট করেছেন। এই ভাবে বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশের মধ্যদিয়ে আখ্যান ক্রমবর্ধমান প্রসারিত হয়ে Climax এ পৌঁছে পরিসমাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। সংলাপকেন্দ্রিক অধিবাচনে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষাতে ও সংলপা রচিত হয়েছে।

যেমন—মন্ত্রীপুত্রের রাজপুত্রকে উদ্দেশ্য করে সংলাপ সাধুভাষায় বর্ণিত—

ক) ''বন্ধু আমরা তো এখানে সুখেই আছি, দেশে কি হইল কে জানে। আমি যাই, পঞ্চকটক দোলা-বাদ্য সকলে নিয়া আসিয়া তোমাদিগকে বরণ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।''

পেঁচোর মায়ের মুখে চলিত রীতির সংলাপ বর্ণিত-পেঁচোর মা রাজাকে বলে—

খ) ''তা রাজামশাই, আমি তো ওষধ জানি তা আমি বুড়ো হাবড়া মেয়েমানুষ, তা আমার পেঁচোর সঙ্গে যদি রাজকন্যার বিয়ে দাও, তো রাজপুত্রকে ওষধ দি।''

আবার পেঁচোর রূপধারী মন্ত্রীপুত্রকে পেঁচো ভেবে বলে—''এই তো আমার বাছা! আহা আহা বুকের মাণিক, কোথায় কোথায় ছিলি ঘরে এলি?—আয় আয়, তোর জন্যে—

''রাজ-রাজিত্ব দুধের বাটী
রাজকন্যা পরিপাটী
সোনার দানা মোহর থান—
সাত রাজার ধন মণি খান—

—তোরই জন্য রেখেছি।'' আলোচ্য রূপকথায় সাধু-চলিতের মিশ্রণে কাব্যময়তা তৈরী হয়েছে। এখানে বর্ণনাংশে সাধুভাষার বহুল ব্যবহার হলেও সংলাপাংশে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিতভাষা ব্যবহার করে কাব্যময়তা তৈরী হয়েছে। কারণ আমরা জানি গদ্যভাষার দুটি উপভাষা—সাধু ও চলিত। আর পদ্যে সাধু-চলিতের মিশ্রিত রূপ। আলোচ্য রূপকথা গদ্যে লেখা হলেও সাধু চলিতের মিশ্রিত রূপ বিদ্যমান। তাই, পদ্যের কাব্যময়তা তৈরী হয়েছে। রূপকথার পাঠক বা শ্রোতা যেহেতু শিশুরা, তাই তাদের বোধগম্যতার জন্য তৎসম শব্দবহুল গুরুগম্ভীর সাধুভাষা বর্জন করে, সহজ সরল অতৎসম ও লৌকিক শব্দবহুল সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। যাতে করে শিশুরা অতিসহজেই রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করে কল্পনার ডানায় ভর করে কাল্পনিক রাজ্যে বিচরণ করতে পারে।

রেজিস্টার

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন কোনও ব্যক্তি তার ভাষাও পরিবর্তন করে ফেলে। ব্যবহার অনুযায়ী ভাষার এই প্রয়োগকে বলা হয়—ভাষা রেজিস্টার ('Language according to use') ব্রাইট (১৯৬৬, ১২) ভাষা ভিন্নতার তথা বৈচিত্র্যের জন্য তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, ১) বার্তার বক্তা বা সম্ভাষক (speaker) কে, প্রেষক (sender) কে, প্রাপক (receiver) বা উদ্দিষ্ট কে, এবং কী বা তার অনুষঙ্গ (setting)। এই সমস্ত কারণের জন্য ভাষা ব্যবহারের যে হেরফের বা তারতম্য হয়ে থাকে তাকে রেজিস্টার বলে অভিহিত করা হয়।[২০] Michael Haliday মনে করেন যে, শব্দের অর্থগত বৈশিষ্ট্য আর প্যাটার্ন নিয়ে তৈরি হয় শৈলী। তিনি দেখতে চান কি হচ্ছে, মূল অংশকে নিচ্ছে এবং ভূমিকা সেখানে কি। ভাষার কাজ কিভাবে অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাষার গঠনের সঙ্গে মিলিত ভাবে জন্ম দেয়। (Lecke-Tarry, Helen, 1995, Context and Language, 6)[২১] মণিমালার সংলাপে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মণিমালা যখন সরোবরের কিনারে ঘ্যাঁঘ্যাঁর করে চরকায় সূতা কাটারত বুড়ীকে দেখে, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলে—''ও বুড়ী, বুড়ী, তুই কোথা থেকে এলি?'' এই সংলাপটি চলিত ভাষার। আবার মণিমালা যখন রাজপুত্রের সঙ্গে কথা বলেন, তখন গল্পকার তার সংলাপে সাধুভাষা প্রয়োগ করেছেন, ''রাজপুত্র আমার ব্রত শেষ হইয়াছে, আমি আজ বরণ-সাজে সাজিয়া নদীর জলে স্নান কবির। আমার সঙ্গে বাদ্য-ভান্ড দিও না, জন-জৌলুষ দিও না, কেবল এক পেঁচো আর রাজকন্যা যাইবেন।'' মণিমালার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অনুযায়ী সংলাপ প্রয়োগের বৈচিত্র্য ভাষা রেজিস্টার তৈরি করে। রূপকথাকার মণিমালার সংলাপে সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সমাজে চরকায় সুতা কাটা বুড়ির অবস্থান কখনই উচ্চেনয়, রাজপুত্রের থেকে। তাই রূপকথাকার সঙ্গে বুড়ির মণিমালার সংলাপে চলিত ভাষা ও রাজপুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে সংলাপে সাধুভাষা প্রয়োগ করে তাদের সামাজিক অবস্থানটি প্রকট করেছেন। কারণ প্রসঙ্গ বা Context-এর সঙ্গে ভাষা রেজিস্টারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ই) অন্তরঙ্গ অধিবাচন (Projective discourse)

অন্তরঙ্গ ধরণের অধিবাচনে লেখক খানিকটা হয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেই পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, যার অনিবার্য ফল অনন্য বয়ানে লেখকের আত্ম প্রক্ষেপণ (self-projection)। অন্যান্য চরিত্রের মতো লেখকও যেন আখ্যানের একজন অন্যতম অংশগ্রাহী (participant) হয়ে ওঠেন। পাঠকের সঙ্গে সংলাপে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।[২২] আলোচ্য রূপকথার গল্পেও অন্তরঙ্গ অধিবাচন লক্ষ্য করা যায়। শিকারে গিয়ে রাজপুত্র পাগল হয়ে ফিরে আসলে, রাজা তার পুত্রকে ভালো করার জন্য টেঁটরা দিয়ে বলেন, ''রাজপুত্রকে যে ভালো করতে পারিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা

তাকে দিব।" তখন গল্পকার প্রশ্নবাক্যের পরম্পরা স্থাপনের মধ্যদিয়ে পাঠককে জানান—'কে ঢেঁটরা ছুঁইবে? কেহই ছুঁইল না।' অর্থাৎ গল্পকার পাঠকদের জানিয়ে দেন রাজপুত্রকে ভালো করার কেউ ছিল না, তাই কেউ এসে ঢেঁটরা ধরেনি। এখানে অন্তরঙ্গ অধিবাচনে রচনার বয়ানে গল্পকার নিজেকে প্রক্ষেপ করেন। পাঠকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যায় উদ্ধৃত অন্তরঙ্গ অধিবাচনে।

বর্ণনামূলক অধিবাচন এবং সংলাপকেন্দ্রিক অধিবাচনে অতৎসম ও লৌকিক শব্দ ব্যবহার :

আলোচ্য রূপকথায় লোক-অভিপ্রায় (folk-motif) তুলে ধরতে গল্পকার অতৎসম ও লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

ক) মণিমালা ক্ষার খৈল দিয়া গা পা কচলাইতে লাগিলেন।

খ) অট্টালিকার মধ্যে সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ শব্দ।

গ) ধবধবে সুন্দর ঘাটলা হইল।

ঘ) বন্ধু, পাহাড়-মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ।

ঙ) রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের গা-অঙ্গ ডোল হইল।

চ) আকাশ পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক কাল-অজগর তাহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত আস্ত গিলিয়া খাইতেছে।

ছ) লেজের বাড়িতে জল শতখান হইয়া যায়।

জ) কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন।

ঝ) মণি, মণি! উজলে ওঠা! এই সরোবরের জলে আমি নাইব।

ঞ) মন্ত্রীপুত্র, আস্তে আস্তে নাইয়া আসিয়াই এক খাবল কাদা আনিয়া মণির উপর ফেলিয়া দিলেন।

অন্যান্য রূপকথার গল্পের মতো আলোচ্য 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পেও অতৎসম ও লৌকিক শব্দ যথাযথ প্রয়োগ করে রূপকথার লৌকিক ধর্ম বজায় রেখেছেন।

আন্বয়িক বিচ্যুতি (Syntactic deviation)

আন্বয়িক বিচ্যুতি (Syntactic deviation) শৈলীবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট দিক। 'ভাষার পদক্রমের যে নির্দিষ্ট রীতি আছে তার বিপর্যাস (inversion) ঘটানো কবিতার এক অন্যতম লক্ষণ। ক্রিয়াপদের পূর্বস্থাপনা, বিশেষ্য-বিশেষণের স্থান পরিবর্তন বা যৌগিক ক্রিয়ার দূরান্বয় প্রভৃতি প্রকৌশলের মাধ্যমে বাক্যিক বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।[২৩] আলোচ্য রূপকথার গদ্যশৈলীতে এই উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করি। ফলে গদ্যে কাব্যময়তা (lyrical)-র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আর এই কাব্যময়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিচ্যুতি (deviation)-র মধ্যদিয়ে। শৈলীবিজ্ঞানে বিচ্যুতি (deviation) হল বাংলা বাক্যে স্বাভাবিক ক্রম (কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া) থেকে সরে এসে বিচ্যুতি ঘটিয়ে (কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম) এক ধরনের কাব্যময়তা তৈরী করা। আলোচ্য রূপকথায় তাঁর একাধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

নর্ম বা স্বাভাবিক ক্রম	বিচ্যুতি ক্রম (রূপকথায় ব্যবহৃত রূপ)
১। আজ তবে মণি, অগাধ জলে চল্।	১। আজ তবে চল্ মণি, অগাধ জলে।
২। দুই বন্ধু তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া সরোবরে নামিলেন।	২। তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবারে নামিলেন।
৩। দুই বন্ধু যতদূর যান-নামিতে নামিতে, জল কেবলই দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়।	৩। নামিতে নামিতে, দুই বন্ধু যতদূর যান জল কেবলই দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়।
৪। মন্ত্রীপুত্র হাসিয়া মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন।	৪। হাসিয়া মন্ত্রীপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন।

নর্ম বা স্বাভাবিক ক্রম	বিচ্যুতি ক্রম (রূপকথায় ব্যবহৃত রূপ)
৫। মণিমালা পৃথিবী দেখিয়া অবাক।	৫। পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক।
৬। রাজপুত্র দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।	৬। দেখিয়াই রাজপুত্র ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।
৭। বুড়ি দেখিয়া চুপটি করে রইল।	৭। দেখিয়া বুড়ি চুপটি করে রইল।
৮। রাজকন্যা শুনিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।	৮। শুনিয়া রাজকন্যা নিঃশ্বাস ছড়িয়া বাঁচিলেন।

এই ধরণের কাব্যময়তা সৃষ্টি রূপকথার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গল্পেও গল্পকার আন্বয়িক বিচ্যুতির মাধ্যমে কাব্যময়তা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়।

সমান্তরলতা (Parallelism)

ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণের বা ছোট ছোট বাক্যের পুনরাবর্তনের ফলে গড়ে ওঠে সমান্তরলতা (Prallelism)। শিশির কুমার দাশ বলেছেন—

> ''সমগঠনের বা প্রায় সমগঠনের যে কোনো আন্বয়িক উপাদানের বারবার ব্যবহার এবং তার ফলেই একটি ধ্বনি সৌকর্যের সৃষ্টি। শুধু একটি বাক্যের মধ্যে নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে এক ধরণের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনের সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ সংগীত এবং সমগ্র অংশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য।।''[২৪]

তবে 'হুবহু পুনরাবৃত্তি সমান্তরালতা নয়।'[২৫] G. Leech বলেছেন, "In any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast.[২৬] আলোচ্য রূপকথায় রূপকথাকার গল্পের সৌকর্যবৃদ্ধিতে ব্যবহার করেছেন, সমান্তরালতা (Parallelism)-র প্যাটার্নটি।

অ) লকলকে চকচকে কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গাইয়া সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন।

ক	খ	গ
১। লকলকে		
২। চকচকে		
৩। কোটি রঙের	কোটি সাপ	ডিঙ্গাইয়া সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন।

সমান্তরাল প্যারাডাইমটির 'ক' Paradism স্তম্ভটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এটি সাপের বিশেষণ বা Modfier অংশযুক্ত। এখানে সমান্তরাল বিশেষণের পুনরাবর্তন মিলের ছন্দময় প্যাটার্ন গড়ে তুলেছেন গল্পকার। কোটি রঙের কোটি সাপ বলতে, বহুল সাপের মোটিফটিকে রূপকথাকার ব্যবহার করেছেন।

আ) সেখানে সাপের দেওয়াল, সাপের থাম, সাপের মেঝে, সাপের কড়ি, সাপের মণির দেওয়াল গিরি।

ক	খ	গ
১) সেখানে	সাপের	থাম
২)	সাপের	মেঝে
৩)	সাপের	কড়ি
৪)	সাপের	দেওয়ালগিরি

এই Paradism এর 'ক' স্তম্ভটি স্থানবাচক বিশেষ্য, 'খ' স্তম্ভটি সম্বন্ধবাচক, 'গ' স্তম্ভটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সুউচ্চ অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ সমান্তরালভাবে সজ্জিত (থাম, মেঝে, কড়ি, দেওয়ালগিরি।) সুউচ্চ অট্টালিকার মধ্যে সাপের বিভিন্ন থাকার স্থান বোঝাতে, রূপকথাকার সমান্তরলতা (Paradism)-র প্যাটার্নটি ব্যবহার করেছেন।

ই) শিয়রের সাপ ফণা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল, আশের সাপ, পাশের সাপ, গা মোড়া দিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে আষ্টে পিষ্টে জড়াইয়া ধরিল।

এই সমান্তরাল প্যারাডাইমগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'কা স্তম্ভটি (শিয়রের সাপ, আশের সাপ, পাশের সাপ) Agent বা কর্তা ভূমিকা প্রাপ্ত। 'খ' স্তম্ভটি (ফণা তুলিয়া, গা মোড়া দিয়া উঠিয়া) Action বা ক্রিয়া ভূমিকা প্রাপ্ত। এই দুটি অংশ মিলে তৈরি করেছে চালক অংশ। বাকিগুলি চল।

ক	খ	গ	ঘ
১। শিয়রের সাপ	ফণা তুলিয়া		গর্জিয়া উঠিল।
২। আশের সাপ			
৩। পাশের সাপ	গা মোড়া দিয়া উঠিয়া	রাজপুত্রকে আষ্টে পিষ্টে	জড়াইয়া ধরিল।

এখানে এই সমান্তরাল প্যারাডাইমগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'ক' স্তম্ভটি (শিয়রের সাপ, আশের সাপ, পাশের সাপ) Agent বা কর্তা ভূমিকা প্রাপ্ত। 'খ' স্তম্ভটি (ফণা তুলিয়া, গা মোড়া দিয়া উঠিয়া) Action বা ক্রিয়া ভূমিকা প্রাপ্ত। এই দুটি মিলে তৈরি করেছে চালক অংশ। বাকিগুলি চল। এইরকম সমান্তরলতা (Parallelism)-র অনেক দৃষ্টান্ত আলোচ্য রূপকথায় পাই। এইরকম সমান্তরলতা (Parallelism)-র ব্যবহার রূপকথার গল্পে কাব্যময়তা তৈরি করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'কথা', চতুর্থ অধ্যায়, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৩০৫।
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ. ১৩।
৪. Brian Attebery, "The Fantasy Tradition in Mathew's American Literature, p. 5.
৫. অনিমেষকান্তি পাল, 'লোকসংস্কৃতি', প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৪, পৃ. ১১৯।
৬. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি', ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অংশ।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের সামগ্রী', রবীন্দ্র রচনাবলী।
৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি', ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অংশ।
৯. পবিত্র সরকার, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', সাহিত্যলোক, ২০০২, পৃ. ১৩৪।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ. ৬২৮।
১১. অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, পৃ. ৯১।
১২. Stephen Ullman, Meaningand Style, Oxford, Basil Blackwell, 1973, p. 43।
১৩. অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, পৃ. ৯১-৯২।
১৪. অপূর্ব কুমার রায়, 'শৈলীবিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ৩০।
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ. ৬৩০।

১৬. অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, পৃ. ৯৩।
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ. ৬৩১।
১৮. অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, পৃ. ১১৪।
১৯. ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড. নীলিমা চক্রবর্তী, ভাষা বিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ৩২৩।
২০. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬০।
২১. দ্রষ্টব্য. ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড. নীলিমা চক্রবর্তী, ভাষা বিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ৩০১।
২২. অভিজিৎ মজুমদার, 'তারাশঙ্কর : নাগিনী কন্যার কাহিনী', অধিবাচন শৈলী ও লোকবৃত্তের শৈলী', অভিজিৎ মজুমদার ও পরেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন' দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ২৫২।
২৩. অভিজিৎ মজুমদার, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, পৃ. ৭৪।
২৪. শিশিরকুমার দাশ, 'কবিতার মিল ও অমিল', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭, পৃ. ৩০।
২৫. অভিজিৎ মজুমদার ও পরেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন' দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৩০০।
২৬. G. Leech : A Linguistic Guide to English Poetry, Longman, London, 1984.

[সমস্ত উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র অন্তর্গত 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্প থেকে।]

অর্ঘ্য হালদার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাসে নারীর ভুবন

কৃষ্ণা ঝুল্কী

বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এক শক্তিশালী প্রতিভাময়ী বাঙালি প্রবাসী লেখিকা হলেন পূর্ণশশী দেবী (১৮৮৮-১৯৬৪)। বর্তমান প্রজন্মের পাঠকের নিকট তিনি আজও সার্বিক অপরিচিতা। পাঠকচক্ষুর অন্তরালে থাকা গভীর সংবেদী এই লেখিকা আজীবন প্রবাসে বাস করেও বাংলা সাহিত্যচর্চায় একান্ত ব্রতী হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের কারনাল শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বেহালায়। পিতা কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মসূত্রে এবং বৈবাহিক সূত্রে চিরজীবন প্রবাসে বসবাস করেন লেখিকা। কথাসাহিত্যের জগতে খুব অল্প বয়সেই তিনি প্রতিষ্ঠা পান। 'আভা' গল্প লিখে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান। লেখিকার শক্তিশালী লেখনীতে একে একে প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন স্বাদের প্রায় ত্রিশটি গল্প, বেশ কিছু প্রবন্ধ, কবিতা, স্মৃতিকথা (মনে পড়ে) এবং পনেরটি উপন্যাস, 'বিচিত্রা', 'উদয়ন', 'জয়শ্রী', 'গল্পলহরী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দান', 'ভ্রম', 'মায়ার বন্ধন', 'নীলপদ্ম', 'পুজোর চিঠি' প্রভৃতি এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'স্নেহময়ী', 'নিশীথ বাদল', 'অভিশপ্তা', 'রাতের ফুল', 'আঁধারে আলো', 'পথে বিপথে' ইত্যাদি।

উপন্যাস হল জীবনেরই কাহিনি। জীবন সমুদ্রের অতলে অবগাহন করে জীবনের ছোট-বড় সমস্যাকে মণি-মুক্তোর মতো তুলে আনেন উপন্যাস শিল্পী। এইসকল সমস্যাগুলিকে বাস্তব কাঠামোয় রূপদান করেন তিনি। এই সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয় ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন। পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাসগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস সমাজ-পরিবারকেন্দ্রিক। বিশ শতকের প্রারম্ভে সমাজ-সময় এবং ব্যক্তিমানসকে লেখিকা অসাধারণ দক্ষতায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিধৃত করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমাজ-সংসারের এক নিখুঁত প্রতিলিপি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রথচক্রে পিষ্ঠ নারীর আর্তনাদে ভরে উঠেছে আকাশ-বাতাস। অবলা নারীর মুখে প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে সবলা নারীতে পরিণত করেছেন লেখিকা। উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা নারীদের পরম মমতায় অঙ্কন করেছেন তিনি। গভীর জীবনবোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি লেখনীগুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বন্দ্ব-জটিল জীবনে সমাজের সঙ্গে থাকে ব্যক্তিমানসের সংঘাত। এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিসত্তাকে উদ্ভাসিত করে উপন্যাসগুলিতে নারী জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ আলেখ্যর সন্ধান দিয়েছেন লেখিকা। সমসাময়িক সমাজের বাস্তব সমস্যার মধ্যে অবতীর্ণ চরিত্রগুলিকে পরম মমতায় প্রত্যক্ষ করে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কাশীতে বাস করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা 'স্মৃতিকথা'য় পাই—

> ''এই অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া আমি নৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম, সারা জীবনেও তাহা পাই নাই। বধূজীবনে শ্বশুরালয়ে যখন ছিলাম তখন এই কাশী নগরীর বাহ্য সৌন্দর্য এবং ভালটাই দেখিয়াছিলাম শুধু, ভিতরকার ক্লেদ ও আবর্জ্জনা দৃষ্টির অগোচর ছিল। এখন ভাল করিয়া দেখিলাম সোনার কাশীর কলঙ্ক কালিমাও কম নাই বড়। বিশ্বনাথের পুণ্যরাজ্য ভণ্ডামী, প্রতারণা ব্যভিচার পাপে কন্টকিত আপাদমস্তক। বিশেষ করিয়া নারীর লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন এখানে যেমন দেখিয়াছি আর কোথাও দেখি নাই, কত পতিতা ও স্বামী-পরিত্যক্তা নারী এখানে কত যে .... বিশ্বনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া কেহ পাপক্ষয় করিতেছে আবার কেহ পাপের ভরা বৃদ্ধি করিতেছে। এই হতভাগিনীদের দুর্দ্দশা ও অধঃপতন দেখিলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিত।''[১]

ঝুল্কী, কৃষ্ণা : পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাসে নারীর ভুবন
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 51-58, ISSN 2249-4332

তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাসে কাশীর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে।

পূর্ণশশী দেবীর পাঁচটি উপন্যাস আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। ভিন্ন আঙ্গিকে এই সকল উপন্যাসে নারী মনস্তত্বকে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা।

'স্নেহময়ী' পূর্ণশশীর লেখা প্রথম সামাজিক উপন্যাস। পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থাকার সময় এই উপন্যাসটি ১৯২২ সালে রচিত হয়। মা ও ছেলের নিগূঢ় বন্ধনের কাহিনি এটি। হরনাথ ও রমানাথ দুই ভাই। কর্মসূত্রে হরনাথ দিল্লিবাসী আর দেশের বাড়িতে বিষয়-আশয় দেখাশুনা করে রমানাথ। দুজনের ভ্রাতৃস্নেহ সারা গ্রামে এক আদর্শস্থল। নিঃসন্তান হরনাথ সংসার জীবনের পঁচিশ বছর পর বিপত্নীক হলে পুনরায় অধিক বয়সে বিবাহ করেন শিবানীকে। এই ঘটনায় রমানাথের স্ত্রী মন্দাকিনী খুশি হলেও অতি তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন রমানাথের ভ্রাতৃপ্রেমে ভাটা পড়ে। মিষ্টভাষী, সদাহাস্যময়ী মন্দার আন্তরিকতা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসা শিবানীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দুইবৎসর পর হরনাথের একটি পুত্রসন্তান হলে মন্দা অত্যন্ত আনন্দিত হলেও রমানাথ একেবারেই খুশি হয় নি। বড় দাদার সন্তান হওয়ায় নতুন শরিকের সৃষ্টি—এ বিষয়টি তাই তার কাছে দাদার অন্যায়-অবিচার বলে মনে হয়েছিল। হঠাৎ হরনাথের মৃত্যু ঘটলে ছোট সন্তানসহ শিবানী রমানাথের কাছেই আসে। কিছুদিন পর শিবানী মারা গেলে মাতৃ-পিতৃহীন দেবনাথ তার ছোট মায়ের কাছে মানুষ হয়। অত্যন্ত স্নেহ-মমতায় মন্দা তার কন্যা উমার সঙ্গে দেবনাথকেও মানুষ করে। দেবনাথকে রমানাথ বেশিদূর পড়াতে না চাইলেও মন্দার জেদের কাছে হার মেনে শেষপর্যন্ত ডাক্তারি পড়াতে মনস্থ করে। প্রথমে রমানাথ এ বিষয়ে কটু মন্তব্য করলে মন্দা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়—

> ''বার বার ওসব কথা মুখে আনতে তোমার একটু বাঁধে না? —তুমি আজ কার রোজগারের পয়সায় নির্ভাবনায় পায়ের ওপর পা দিয়ে দিন কাটাচ্ছ তা শুনি? দেবুর বাবা সাহায্য না করলে তোমার এসব বিষয় আশয় হত কার বাড়ী থেকে?''[২]

দেবু ডাক্তারি পড়তে গেলে বই কেনার জন্য মন্দা গয়না বন্ধক দিয়ে লুকিয়ে তাকে কিছু টাকা পাঠালে রমানাথ জানতে পারে এবং পুজোর ছুটিতে বাড়িতে আসার পূর্বেই দেবুকে চিঠি পাঠিয়ে কৌশলে এই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে। মন্দা এ বিষয় জানতে পেরে তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় এবং শয্যাশায়ী হয়। রমানাথ দেবুর সঙ্গে মন্দাকেও যে শাস্তি দিতে চেয়েছে একথা মন্দা অনুভব করে। তার কিছু করার থাকে না। স্নেহময়ী জননী এই কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় দেবু দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে অন্য একটি পরিবারে স্থান পায়। পরে সেই পরিবারের চেষ্টায় মৃত্যুপথযাত্রী ছোটমায়ের সঙ্গে দেবুর আবার সাক্ষাৎ ঘটে। রমানাথও তার নিজের ভুল বুঝতে পারে।

নারী হৃদয়ের গভীর গোপন, দুঃখ, ব্যথা, সুখ সবকিছুই নারীসুলভ দৃষ্টিতে দেখেছেন পূর্ণশশী। যে সময় এবং সমাজে দাঁড়িয়ে মন্দা তার স্বামীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছে তা ভাবতে আমাদের অবাক লাগে। পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের প্রবীণ স্বামীকে ন্যায়-অন্যায় বোধ মনে করাতে এতটুকু পিছপা হয় নি মন্দা। নিজের বংশের একমাত্র প্রদীপ দাদার পুত্র দেবুকে সেভাবে কোনদিনই আপন পুত্র বলে মনে করতে পারে নি রমানাথ। এই সংসারে দেবুরও যে পূর্ণমাত্রায় অধিকার রয়েছে এবং চাইলে এই সম্পত্তির চুলচেরা ভাগও সে করে নিতে পারে একথা খুব সহজেই জানিয়েছে মন্দা—

> ''জানি গো জানি, আমি সমস্তই জানি। কিন্তু হক্ কথা বলতে ছোট বউ কোনও দিন ভয় পায় নি, পারেও না! —তা যতই চোখ রাঙাও না কেন!''[৩]

কাকার ওপর নির্ভরশীল দেবুর পড়ার অতিরিক্ত খরচ যোগাতে মন্দা নিঃসঙ্কোচে নিজের গহনা বন্ধক দিয়েছে। স্নেহশীলা মাতা সন্তানের সুখ-ভবিষ্যত সবসময় নিশ্চিত করতে চায়, যা মন্দার মধ্যে অতি মাত্রায় লক্ষণীয়। দেবুকে না পেলে মন্দাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। এই সত্য রমানাথ অনুভব করে। পরে ঘটনাচক্রে দেবু ফিরে এলে মন্দা আবার বাঁচতে চেয়ে

ব্যাকুলভাবে বলে—

> ''... তবে বাঁচা—ওরে দেবু! তবে আজ তোর ছোট মাকে বাঁচিয়ে তোল বাবা! .... আমি মরতে চাইনে. .... আমাকে বাঁচিয়ে তোল।''[৪]

সন্তান ও মায়ের বন্ধন যে কতটা নিবিড় তা এই স্নেহশীলা কর্তব্যপরায়ণা, কল্যাণী নারী মন্দার মধ্য দিয়ে লেখিকা ঘটনা পরম্পরায় চিত্রিত করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ, স্বামীর প্রতি অভিমান, সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ মন্দাকে এক ঐশ্বর্যময়ী দেবী প্রতিমায় উত্তীর্ণ করেছে। 'স্নেহময়ী'র ভূমিকা অংশে লেখিকার মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

> ''কিন্তু আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে মনে হয় আমাদের দুঃখ দৈন্য পীড়িত, নিত্য অভাবগ্রস্ত গৃহস্থ সংসারে প্রকৃত স্নেহময়ীর সংখ্যা যেন দিন দিন বিরল হইয়া আসিতেছে। তাই আমার 'স্নেহময়ী'র পবিত্র আদর্শে, বঙ্গের ঘরে ঘরে স্নেহময়ীর প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই আজ এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি সাধারণে প্রকাশিত করিলাম।''[৫]

'স্নেহময়ী' উপন্যাসে মন্দা প্রকৃত স্নেহময়ী হয়ে উঠেছে। আর তার মন্দাকিনী নামের পবিত্র স্বর্গীয় ঝরণাধারায় সংসারের সকল গ্লানি ধৌত হয়ে গেছে।

১৩৩৫ সালে প্রকাশিত 'রূপহীনা' উপন্যাসের সংক্ষেপিত সংস্করণ 'চিত্ত ও বিত্ত', 'রূপহীনা' উপন্যাসটির মূল কপি না পাওয়ায় 'চিত্ত ও বিত্ত' আলোচিত হল। সংক্ষেপিত সংস্করণটি শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে চব্বিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। দুই বোনের গল্প এটি। নারী মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব-জটিল দিক উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য। নন্দনপুর স্টেটের পরম মাননীয় রাজা ওঙ্কারনাথ দত্ত বাহাদুরের একমাত্র পুত্র প্রণবনাথ। কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভে আসা প্রণবনাথের কুসঙ্গে পড়ে চারিত্রিক, নৈতিক অধঃপতন ঘটলে, ওঙ্কারনাথ ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে তাকে তাড়িয়ে দেন। ওঙ্কারনাথের তিরস্কার ও অপমানে বাড়ি থেকে বিতাড়িত প্রণবনাথ নিরুদ্দেশ হয়। পরে বিপত্নীক প্রণবনাথ পুরীতে বাস করতে থাকে। তার দুই কন্যা—বড় কৃষ্ণা এবং ছোট রত্না। ছোট রত্না অপরূপা, আর কৃষ্ণার রূপ না থাকলেও সে সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। লেখিকা দুজনকে বর্ণনা করেছেন—''রত্নার পাশে কৃষ্ণা .... যেন গোলাপের পাশে অপরাজিতা।''[৬]

প্রণবলালের বন্ধু-স্থানীয় অনিলেশের সঙ্গে রত্নার প্রণয় গড়ে ওঠে। এরপর মৃত্যুপথযাত্রী প্রণবনাথের পত্র পেয়ে তার পিতা ওঙ্কারনাথের আগমন, দুই নাতনির দায়িত্বগ্রহণ, প্রথানুসারে, বড় নাতনি কৃষ্ণাকে নন্দনপুরের রানীর মর্যাদা ঘোষণা, অনিলেশের সঙ্গে রত্নার বিবাহ প্রস্তাব মেনে না নেওয়া এবং কিছুদিনের মধ্যে ওঙ্কারনাথের মৃত্যু—সব ঘটনাই চকিতে ঘটে যায়।

ধূর্ত অনিলেশ রাজকন্যা আর সম্পত্তির লোভে রত্নাকে প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণাকে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। অনিলেশের মিষ্টি কথা, সম্মোহিত দৃষ্টি কৃষ্ণাকে আকৃষ্ট করে। রত্না ও কৃষ্ণার ভুল ভাঙাতে ব্যর্থ হয়। ওঙ্কারনাথের শেষ ইচ্ছানুসারে, অনিলেশ নন্দনপুরের স্থায়ী অধিকার পেতে ব্যর্থ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। কৃষ্ণা প্রথম থেকেই অনিলেশকে পছন্দ করলেও পরে তার লোভী মনকে চিনতে পেরে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পরে কৃষ্ণার ইচ্ছানুসারে, নন্দনপুর স্টেটের দায়িত্ব ওঙ্কারনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে অর্পিত হয় এবং কৃষ্ণা স্বেচ্ছায় সবকিছু ত্যাগ করে পুরীতে নিজেদের বাড়িতে চলে আসে। সেখানে সৎ কাজে মনোনিবেশ করে। অনিলেশকে কৃষ্ণা প্রকৃত ভালবেসেছিল, তাই পুরীতে ফিরে এসে—

> ''পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও বিধবার সকল আচার-নিয়ম পালন করে থাকে .... কারো বাধা-নিষেধ না মেনে .... চিত্ত-বৃত্তি শান্ত-সংযত করবার জন্য।''[৭]

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করে এবং দুঃস্থ, নির্যাতিতা, অসহায়া নারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্পের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণা নারী সংঘ গড়ে তোলে, এইভাবে কাজের মধ্য দিয়ে মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে।

প্রথম থেকেই কৃষ্ণা চরিত্রের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, অসুস্থ পিতার সেবা করা, ছোট বোনকে স্নেহ করা, অনিলেশকে মনে মনে পছন্দ করলেও রত্নার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবকে সমর্থন করা—এ সবই তার কোমল

হৃদয়ের পরিচয়। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণার অবস্থানের পরিবর্তনে অনিলেশের মনেরও হঠাৎ পরিবর্তন এবং কৃষ্ণাকে হস্তগত করে সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য ঘৃণ্য চক্রান্ত—কৃষ্ণার সরলতার জন্য সম্ভব হয়েছে। নন্দনপুরের সম্পত্তি সে একা কখনই গ্রহণ করতে চায় নি, রত্নাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সম্পত্তি ভোগ করার মানসিক ইচ্ছাও সে ত্যাগ করেছে। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য নন্দনপুর ত্যাগ করতে পেরেছে। লেখিকা নারী স্বাধীনতার দিকটিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ-সংসারের কোন বিধি-নিষেধ কৃষ্ণা মানে নি। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা তাকে সেবামূলক কর্মে ব্রতী করেছে। কৃষ্ণার ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনে অনিলেশের মধ্যে থাকা লোভের আগুন নিভে গেছে। সে তার কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কৃষ্ণার উদারতা ও ভালবাসা তাকে ক্ষমা করেছে। একেবারে শেষ পর্যায়ে অনিলেশের দৃষ্টিতে আমরা কৃষ্ণাকে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। রূপহীনা কৃষ্ণা আর নন্দনপুরের রানী নয়, একথা জেনেও সে সহজেই বলতে পেরেছে—

> ''.... তোমার হৃদয় রাজ্যের তুলনায় নন্দনপুর অতি তুচ্ছ। .... তোমার রূপ ঐ নীল সাগরের মতই অসীম সুন্দর। আমি তখন অন্ধ ছিলাম, তাই তোমার এ অফুরন্ত অপরূপ রূপ দেখতে পাইনি। .... ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা ক'রে চরণতলে স্থান দাও শুধু .... আর আমি কিছুই চাই না।''[৮]

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের কথা মনে পড়ে যায়। এখানে অনিলেশের অন্তরের সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই ঐশ্বর্যের লোভ আর রূপজ মোহের জাল ছিন্ন করে রূপহীনা কৃষ্ণার পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা সে অনুভব করতে পেরেছে।

১৩৪০ সালে 'পুষ্পপাত্র' নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'নিশেহারা' উপন্যাসটি 'স্রোতের মুখে' নামে ১৯৫০-এর দশকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র রেণু। স্বামী পরিত্যক্তা, ভাগ্য বিড়ম্বিতা রেণুর জীবনের বেঁচে থাকার লড়াই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। মাতাল, দোজবরে, অত্যাচারী স্বামী বিতাড়িত রেণু বাপের বাড়ি ফিরে আসার পর অভিনেতা মোহিতের সঙ্গে পরিচিত হয়, গৃহত্যাগী রেণুর থিয়েটার দলে যোগদান, সুনাম অর্জন, মোহিতের আচার-আচরণে ক্ষুব্ধ রেণুর মোহভঙ্গ, সেখান থেকে পালিয়ে যাবার পথে অসুস্থ রেণুর হাসপাতালে স্থান, সেখানে ডাক্তারবাবু সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টানো এবং খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সাঁওতাল পরগণায় হেডমিসট্রেসের পদে যোগদান—এসব কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটে রেণুর জীবনে। এরপর আরো চমকপ্রদ ঘটনা অপেক্ষা করে রেণুর জীবনে। শিক্ষিকার চাকুরি করার সময় সেক্রেটারির বিপত্নীক ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব রেণুকে দিশেহারা করে তোলে। রেণু আবার স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে সিনেমা জগতের উজ্জ্বল তারকা সাহানা দেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রেণুর জীবনে স্বাধীনভাবে বাঁচার আকাঙ্খা থাকলেও তা এইভাবে রেণুর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে তা রেণু ভাবতে পারেনি। দাদার মতো শ্রদ্ধা করা মোহিতকে সে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু থিয়েটারের জগতে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং মোহিতের আচরণ তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। প্রথমে মোহিতের কাছে থিয়েটার জগতের গল্প শুনে তার দুচোখে স্বপ্ন নেমে এসেছিল—

> ''যশ সম্মান গৌরবে সমুজ্জ্বল সে কি সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবন। তার কাছে রেণুর এই লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত অসহায় জীবন কত তুচ্ছ, কত হীন। একদিকে আলোর বন্যা অন্যদিকে ঘন-তমসা। দুদিকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।''[৯]

বিনোদন জগতের সেই মোহময়, স্বপ্নময় হাতছানিতে রেণু দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল। শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলহারা রেণুর জীবনে শুরু হয় এক অন্য লড়াই। নারীলোলুপদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার হৃদয়-মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে। আজন্মলালিত হিন্দু সংস্কার এই জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার চারিত্রিক ও নৈতিক অবনতির ভয়ে সে ঐ স্থান ত্যাগ করে, কিন্তু ভাগ্য শেষপর্যন্ত তাকে এই বিনোদনের জগতেই ফিরিয়ে আনে। জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সেই তুচ্ছ ক্ষুদ্র নারী

শতসহস্র পাপড়ি মেলা ফুলের মতো সিনেমা জগতের তারকা সাহানা দেবী রূপে পরিচিত হয়। তার জীবনের অজানা অধ্যায় কাউকেই সে বলতে পারে নি। শিক্ষকতা করার সময় মীরার দাদাকেও মন থেকে গ্রহণ করতে পারে নি—

> ''আপনি জানেন না, আমি কত .... কত বড় অভাগিনী!''[১০]

ভাগ্যহতা রেণু শেষপর্যন্ত অর্থ, যশ পেলেও মাঝে মাঝে তার হৃদয় মথিত হয়ে এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে—

> ''এই কি জীবন? এই জীবনই কি সে কামনা করেছিল মনে-প্রাণে?''[১১]

এই প্রশ্নের উত্তর রেণুর কাছে অজানা, আসলে পরিস্থিতির শিকার রেণু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সেই পরিস্থিতিই তাকে ঘূর্ণির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। স্বামী পরিত্যক্তা এবং দাদার স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত জীবনে অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মান সব থাকা সত্ত্বেও রেণু যথার্থ অর্থে সুখী হতে পারে নি। বাইরের জগৎ আর মনের জগতের মধ্যে মিল খুঁজে পায়নি সে। জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত রেণু অভিনয় জগতকেই শেষপর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছে। স্বামীর কাছে রেণুর স্থান না হলেও যে ভারতীয় সংস্কার তার মনে প্রথিত ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পথ সে খুঁজে নিয়েছে। প্রায় একশ বছর পূর্বের সমাজে নারীর স্বাধীন ভাবনা এবং বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীন পেশা গ্রহণকে লেখিকা সমর্থন জানিয়েছেন। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার যে নারীর রয়েছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন পূর্ণশশী। আধুনিক নারীর দৃষ্টিভঙ্গী রেণুর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি।

'রাতের ফুল' উপন্যাসটি 'উদয়ন' পত্রিকায় মাঘ ১৩৪০ থেকে শ্রাবণ ১৩৪১ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। পরে ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি ডায়েরি ফর্মে লেখা।

উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র স্ব-অভিভাবক, অবিবাহিত, স্বচ্ছল যুবক পবিত্র এবং কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র রজনী। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের জনসমারোহের মধ্যে অসুস্থ বিধবা মায়ের পাশে ক্রন্দনরত অবস্থায় রজনীর সঙ্গে পবিত্রর পরিচয়। অসহায়া মৃত্যুপথযাত্রী বিধবার অনুরোধে তার মৃত্যুর পর রজনীকে পবিত্র ঘরে আনে। রজনী তার অতীত সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু না জানানোয় সমাজে তার ঠাঁই পাওয়া কঠিন ছিল। সেসময় কাশীর বিধবাদের অন্নসংস্থানের জন্য নানা কাজের সঙ্গে বিপথগামিতাও ছিল। তাই কাশীর বিধবাদের সন্তানরা সমাজে ছিল ব্রাত্য। পবিত্র কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে তার পরিবারে নিয়ে এলেও রজনীকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়ে তাকে রক্ষিতার মতো স্থান দিল। রজনীর প্রতি তার আকর্ষণ ভালবাসা বলে মনে হলেও বন্ধু স্থানীয় জ্যোতিষের স্ত্রী এর প্রতিবাদ করে। একজন নারী হয়ে নারীত্বের এই অপমান সহ্য না করে বলে—

> ''তুমি ভুল করছ ঠাকুরপো। মস্ত বড় ভুল। তোমার পয়সা আছে, প্রতিপত্তি আছে তাই, আমাদের ঘরে হলে এদ্দিন ....।''[১২]

এরপর ব্যারিস্টারের মেয়ে লিলির সঙ্গে পবিত্রর পরিচয়, রজনীকে ত্যাগের সংকল্প, অসুস্থ রজনীর বিষপানে আত্মহত্যা কাহিনিকে পরিণতি দান করেছে।

উপন্যাসটিতে রজনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সেই সময়কার সমাজে অসহায়া, পরিবার পরিচয়হীন নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাশীতে বাস করার সময় লেখিকা বিধবা নারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা জেনেও রজনীকে পবিত্র স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি, সমাজ-সংসার তার নারীত্বের সম্মান রক্ষা করেনি। পবিত্রর মধ্যে সংশয়ের দোলাচলতা রজনী অনুভব করলেও তার কিছু করার ছিল না। পবিত্রকে প্রকৃত ভালবেসেছিল বলে নারীত্বের এই অপমানও মুখ বুঝে সে সহ্য করেছিল। শাড়ি, গহনা, সম্পদেই যে নারীকে সুখে রাখা যায়, এই বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে পবিত্র কখনোই রজনীর হৃদয়-মনের আভাস পাওয়ার চেষ্টা করে নি। লিলিকে পাওয়ার জন্য রজনীকে ত্যাগ করতেও পবিত্র প্রস্তুত। তার প্রতি এই অবহেলা-বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয় অসুস্থ রজনী। রজনীর প্রতি পবিত্রর ভালবাসা যে যথার্থ নয়, শুধুই মোহ ছিল, একথা অনুভব করে এ পথ রজনী বেছে নিয়েছে। পবিত্রও নিজের এই কৃতকর্মের জন্য

অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে, পবিত্রর মুখে লেখিকার অন্তরের প্রতিধ্বনিই শোনা যায়—

> ''রজনীগন্ধা রাতের ফুল, রাতের আঁধারেই ঝরে গেছে।''[১৩]

'আঁধারে-আলো' উপন্যাসটি 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় ১৩৪২ সালে বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এটির নামকরণ হয় 'মনের মানা নেই'। এই উপন্যাসটির পরিণতি প্রকাশের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখিকা মিলনান্তক করেন।

'আঁধারে-আলো' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র হল সীমা। তার নামের সঙ্গে জীবনেরও যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সীতার জীবন কাহিনি এবং পরিণতি পাঠক হৃদয়কে মথিত করে। জমিদার জিতেন চাটুয্যের পালিতা কন্যা সীতা। জমিদার গৃহিনীর পূর্বপ্রণয়ী ব্যারিস্টার মনোহর গাঙ্গুলীর চক্রান্তে তাদের মেয়ে ডলি চুরি হয় এবং সীতা জমিদার বাড়িতে এসে পড়ে। এরপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবিতা সেই শিশুটিকে মানুষ করলেও কখনই নিজের মেয়ের স্থান দিতে পারে নি। উঠতে বসতে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা এমনকি জন্ম নিয়েও কটু কথা শুনতে হয়েছে সীতাকে। গ্রামের ছেলে শেখরকে সে পছন্দ করলেও শেখর কখনই তার মনের খোঁজ পায় নি। কিশোরী সীতা তার দুর্ভাগ্যের বিষয় জানতে পেরে গৃহত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে কলকাতায় বাল্যবন্ধু বেণুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ, আর্টিস্ট অরুণের সাহায্যে ভদ্রবাড়িতে গভর্নেসের কাজ পাওয়া, মাতুল মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ—সীতার জীবনের এক অজানা অধ্যায়কে উন্মুক্ত করে। মাতুলের পত্র থেকে সে জানতে পারে—

> ''জমিদারের ভাইঝি সীতার মাতুল একটা বেশ্যানুগৃহীত ভ্যাগাবণ্ড, আর তার গর্ভধারিনী একজন অভিনেত্রী।''[১৪]

মনোহর তার মাতাকে হত্যা করেছে এবং জমিদারের কন্যাসহ পুরীতে নিশ্চিন্তে বাস করছে। এই ঘটনা জানার পর সীতা শেখরের সাহায্যে পুরীতে পৌঁছায় এবং পিতা মনোহরের মুখোমুখি হয়। তার পালিতা কন্যাকে জমিদারের বাড়িতে ফিরিয়ে দিতেই তার এখানে আসা—একথা মনোহরকে জানায়। পরে মনোহরের মৃত্যু হলে সীতা শেখর ও সবিতার প্রণয় অনুভব করে ঝড়ের রাতে গৃহত্যাগ করে।

ছোট থেকেই সীতাকে লেখিকা সাহসী ও দৃঢ় মানসিকতার অধিকারিণী করেছেন। নিজের জন্ম কলঙ্ক মাথায় নিয়েও শুধুমাত্র জমিদার বাড়ির ঋণশোধের জন্য সে নিষ্ঠুর পিতা মনোহরের মুখোমুখি হয়েছে। সবিতাকে জমিদার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। কোন অন্যায় বা খারাপ ব্যবহার সে করেনি। মনোহর সব স্বীকার করে তাকে অর্থ সাহায্য করতে চাইলে সীতা দৃঢ়কণ্ঠে তা প্রত্যাখ্যান করেছে—

> ''আপনার উপদেশ শিরোধার্য। কিন্তু মাপ করবেন, যদি পথেঘাটে ভিক্ষে করে খেতে হয় তবুও আপনার দেওয়া একটি কপর্দকও আমি হাত পেতে নিতে পারব না।''[১৫]

তার মাতুলের প্রতিশোধস্পৃহাকে পর্যন্ত সীতা দমন করেছে এবং পিতার স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছে। মনোহরের মনও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। অসুস্থ পিতাকে সে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সেবা করেছে। আবার মনোহরের ইচ্ছেতে সবিতাকে তার অতীত পরিচয় সম্পর্কে অবগত করাতে পেরেছে। যে পথে সীতা চলেছিল, শেখরই একমাত্র তাকে ফিরিয়ে আনতে পারত। কিন্তু শেখরের মনের পরিবর্তন সীতা আর সহ্য করতে পারে নি।

সীতার জীবনের কোন অধ্যায়ই সুখের হয় নি। যত সময় অতিবাহিত হয়েছে, জীবন সম্পর্কে আরো কঠিন বাস্তববাদী হয়েছে সে। কৈশোরের সাহসিকতার জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্তও সে নিতে পেরেছে। সমাজ-সংসার-ভালবাসা সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে—তাকেই পাথেয় করে অজানা অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়েছে। সংসারের একমাত্র বন্ধন শেখরকে মুক্তি দিয়ে ''সেই দুর্যোগ সংক্ষুব্ধ নিশীথের ঘন-অন্ধকারে ঝড়-ঝঞ্ঝায় মাতামাতির মধ্যে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ছুটিয়া চলিল—কোথায়—কে জানে?''[১৬]

এই পৃথিবীতে সীতার প্রকৃত আপনজন বলতে কেউ ছিল না। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে থাকে ত্যাগ। তাই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গের দিব্য সঙ্গীতের মতো দেশমাতার কান্নাভরা ব্যাকুল প্রাণের আহ্বান শুনতে পেয়েছিল সীতা—

"ওরে আয় আয়!
তোর পথ জানা নাই নাইবা জানা নাই
নাই মানা নাই,—মনের মানা নাই—"[১৭]

উপরোক্ত উপন্যাসগুলিতে নারীকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন রূপে চিত্রিত করেছেন পূর্ণশশী। অনেকক্ষেত্রে সমাজের চেনা বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে নারীও খুঁজেছে মুক্তির পথ। পুরুষশাসিত সমাজের চালিকাশক্তিকে অস্বীকার করেছে তারা। কখনো নীরবে আবার কখনো সরবে হয়েছে সেই প্রতিবাদ। স্নেহময়ী জননী মন্দা নিজের স্বামীর অন্যায়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। নীরব প্রতিবাদে তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছে। আবার রেণু জীবনে চেনা ছক থেকে বাইরে বেরিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বোধের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সে। নারীর অপমান, লাঞ্ছনা যুগ যুগ ধরে সাহিত্যে এসেছে। সে সময়ে পূর্ণশশী দেবী উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে যুগে নারী প্রতিবাদের ভাষা ছিল নীরব। অসহায়া, ভাগ্যবিড়ম্বিতার নারীত্বের সম্মান কোথাও ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর কাশীতে বসবাসের সময় নারীর সেই লাঞ্ছনা, অপমানের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। লেখিকা নিজে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে সংসার নির্বাহ করেছেন। তাই নারীর হৃদয়ের গভীর ক্ষত অত্যন্ত মানবিকতার সঙ্গে অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছনা, অপমানের অন্ত থাকে না। পুরুষের দোষ সমাজ উপেক্ষনীয়। তাই রজনীর নারীত্বকে সহজেই অপমান করতে পেরেছে পবিত্র। স্ত্রীর মর্যাদা না পেয়েও দিনের পর দিন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছে নারীকে। এ যে কতবড় লজ্জার অপমানের তা অনুভব করার মানসিকতা নেই পুরুষের। তাই ভালবাসার স্বীকৃতি না পেয়ে অকালে ঝরে যেতে হয় রজনীকে। এও এক নীরব প্রতিবাদ। অন্যদিকে সীতার অভিমান সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে। মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এই সকল নারীরা। বর্তমানে ভোগবাদী সমাজে নারী প্রতিবাদের ভাষা ভিন্ন হলেও লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমানের হাত থেকে রেহাই পায় না তারা। তবে এই অপমানের পদ্ধতিটা শুধু বদলেছে। নারীর প্রকৃত মর্যাদা সমাজ-সংসার কমই দিয়েছে। পূর্ণশশীর কলমে নারীভুবনে চেনা ছকে অচেনা ছবি আমাদের বিস্মিত করে।

সূত্রনির্দেশ

১. স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ণশশী দেবীর নির্বাচিত রচনা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৮৩।
২. পূর্ণশশী দেবীর রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, 'স্নেহময়ী', প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৭।
৩. তদেব, পৃ. ৩৭।
৪. তদেব, পৃ. ৭৫।
৫. তদেব, 'স্নেহময়ী' উপন্যাসের ভূমিকা অংশ।
৬. পূর্ণশশী দেবীর রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, 'চিত্ত ও বিত্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।
৭. তদেব, পৃ. ২৮৫।
৮. তদেব, পৃ. ২৮৭।
৯. স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, ' স্রোতের মুখে', পৃ. ৩৭।
১০. তদেব, পৃ. ৬০।
১১. তদেব, পৃ. ৬১।
১২. পূর্ণশশী দেবীর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, 'রাতের ফুল', প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৭৩।

১৩. তদেব, পৃ. ২৩২।
১৪. পূর্ণশশী দেবীর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, 'আঁধারে-আলো', পৃ. ২৭৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩৫।
১৬. তদেব, পৃ. ৩৭২।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৭২।

কৃষ্ণা ঝুল্কী
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
কাঁচড়াপাড়া কলেজ, উত্তর ২৪ পরগণা।

Transit Route of Bengal Kansaris : A Study

Alok Kumar Biswas

Nabadwip is a city under municipal administration in the district of Nadia in West Bengal. It is seated on the western bank of the Bhagirathi River. The Bhagirathi river originally flowed down the west of Nabadwip in the past, forming a natural boundary between the districts of Burdwan and Nadia. The city was capital of Sen Dynasty in Medieval periods. It was a centre of learning and philosophy in medieval times in India. The great Vaishnava saint, social reformer and an important figure of *Bhakti* movement, Chaitanya Mahaprabhu (1486-1533) was born here. It was known as 'Oxford of the East' due to its education and culture. It is not only famous for its *tol* education but also for its crafts like Brass ware and Bell-metal work, Conch Shell work and traditional handloom.

Early History of *Kansari*

W. W. Hunter once wrote, "in terms of the size of the workforce; the Kansari's industry in Bengal was second only to handloom weaving".[1] This was stated by Hunter with regard to Nadia, although his observation was applicable to all of Bengal. Hunter mentions Nadia district as the foremost production centre with regard to Matiary as the biggest centre and then Nabadwip the second largest brassware manufacturing centre. In historical perspective the city of Nabadwip is well known for its religious movement committed by Shree Chaitannya Mahaprovho in fifteenth century. After that Nabadwip flourished and artisan groups installed their production centre here. As a migratory craft, the Kansari artisan came here and settled their production centres in medieval period when the city of Saptagram declined. Two major causes of growth of a brass production centre of this city, one is religious centre and other is good transport system.

From ancient times, several types of craftsmen produce different types of artistic crafts in Bengal. The craft of the Kansaris had their origin outside Bengal because the raw materials of Brass were not available there.[2] This fact not only affected the Brass craft, it also affected the production of conch bangles and other indigenous craft industries of Bengal. If the availability of copper can be taken as a determinant, then the utensil manufacturing in eastern India seems to have flourished first in the Dhalbhum-Singbhum region, where ancient remains of copper mining have been discovered.[3] As a migratory craft, the metal ware manufacturing in Bengal had its early growth in the western part of the province known as *Rurh* and must have been

Biswas, Alok Kumar : Transit Route of Bengal Kansaris : A Study
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 2, December 2019, Page : 59-66, ISSN 2249-4332

related to the early development of metallurgical skill in this region. The early concentration of Kansari in Midnapore as an exit route of Brass from Dhalbhum and Singhbhum is notable. After the decline of Tamralipta the ancient city of Bengal, the Kansaris shifted their production centre to Saptagram from Tamralipta. The city of Tamralipta was completely declined by the middle of eighth century.[4] The emergence of Saptagram, the foremost port of medieval Bengal, as a thriving centre of trade and manufacture, brought about a transformation in the Kansari's craft at the beginning of eighth century. After decline of the city of Saptagram the artisan groups settled their production centre at Nabadwip, Santipur, Khardah and other places of Bengal.[5]

A small group of kansari migrated from Saptagram to Bhabanipur in Calcutta. It is very interesting that before the city of Calcutta flourished, Bhabanipur was an ostentatiops city. Calcutta was most important of all these centers both in terms of the size of its workforce and the volume of its production. The city had a small Kansari population in and around Kalighat long before the place had attracted the English traders. Only non-kansari have captured the manufacturing system of brassware in recent Nabadwip instead of traditional Kansaris who had come here from several parts of Bengal. We find that a section of the Kansaris of Nabadwip was thus known as *Kalighati* suggesting their early migration from Kalighat to Nabadwip sometime in the late pre-colonial period, when there had been similar movements to that place.[6]

Kansaris to Non-kansaris:

Caste system in India had begun in the early Vedic period, which is still continuing. Later, changes have occurred in the caste system. The society generates different types of professional workforce for its own need. As Kansari groups begun after its production while the raw material found in his periphery. The Kansari group always put up their production centres in city or near cities because the Kansaris had no strong relation with villages for their high price productions. The result was a Kansari concentration at Saptagram like the concentration of similar other artisan groups in that place. This is clearly indicated by the emergence of *Saptagrami Gains* or *thaks* or sub-casted among a number of artisan cases in Bengal, including the Kansaris. The high rank enjoyed by the *Saptagrami Kansaris*, particularly its nucleus-the Nandans, in the social hierarchy of the Kansaris in Bengal is suggestive of the cataclysmic role the early Kansari settlers of this place had in the transformation of their craft.

As a high rank Kansari in social respect, the Saptagrami Kansiris deserved that position in Bengal. Other similar groups were like Mahitas, Mahutpuris and Mahmudpuris. The scenario had changed when the market demand shifted and the descendants of the Kansaris became unwilling to take up or continue with the family profession. The absence of similar sub-castes among the Kansaris of Bengal clearly suggests that the influx of low caste outsiders into the Kansari's occupation was of a later origin. In fact the incident occurred not only in Kansari groups, it also found in case of *Tantis* (Weavers) of Bengal. We find the observation of

H.H.Risley that the sub-castes of the *Tantis* of Bengal like *Kayeth-Tanti*, *Kayeth-Tanti*, *Kathure-Tanti*, *Chamar-Tanti* and *Mjhi-Tanti* indicated the extent of mobility of different occupational groups into the weaver's job.[7] In Nabadwip a large number of artisans working with brassware were *Rajbanshi* and *Namasudra*. The lower castes were involved in brass ware production in the beginning of twentieth century as the work was toilsome.

Colonial Scenario of Kansaris

In colonial period, Kansaris sold their products partly by cash and partly in exchange of broken wares. So the Kansaris were both producers and sellers. The scenario of post colonialism was very comfortable to the Kansari artisan because a small amount of capital was required for their products. As to the raw material, either they bought the metals in small quantities at a time or procured it in a group with fellow artisans. The rapid growth of their industry in the late pre-colonial period thus brought about important changes in the sphere of production.[8]

Nabadwip Kansaris exported a large scale of belle-metal ware to Calcutta and other places.

Kansari groups of Bengal increased their production demanded by the market due to growing *Swadehi* movement. In the late pre-colonial Bengal, the Kansaris may have been forced by the increasing demand for their utensils to induct non-Kansari labour for the more laborious and unskilled parts of their job such as hammering and polishing. In this connection a large scale of laborious artisans engaged themselves in these works with their best effort. In Nabadwip a group of non-Kansaris settled their professional life in brass manufacturing. The Kansari para of Nabadwip has changed its name into Ram-Sita para due to unavailable virgin Kansari groups. If one visits the brass metal production centre of Nabadwip, he/she will not find a native Kansari in production, they are only engaged in business. Throughout the nineteenth and the early twentieth century, the Kansari's industry underwent significant expansion. In 1894, T. N. Mukherjee thus observed '… every household now possesses more utensils than it did in former times and a larger assortment of such articles is now presented to the bridegroom on the occasion of every marriage… . The industry is, therefore, a thriving one.[9]

Un-changing mentality of Kansaris

According to Indian tradition the craft artisans were centric to their production. The artisans did not want to spread their business to others. In fact, the durability, the brightness and the finish of the utensils actually depended on the relative share of the composing metals like copper, tin and zinc in the Kansari's mould. The technique of making this composition, varying with the Kansari sub-group (gain), was usually handed down from the Kansari artisan to his son in the form of the *Vejj Mantra* (secret formula). Its secrecy was further enforced by the Kansari ritual of preparing this composition after dusk, which ensured the absence of outsiders in his house.[10] In this connection, we have found that in the well known Kansaripara of Khagra

at Berhampore in Murshidabad district and Nabadwip Kansaripara, not a single virgin Kansari is involved in brass-metal work. Several visits at Kansaripara (Khagra-Berhampore) and Nabadwip Kansaripara revealed that large scale laborious workers with surnames like Mondal, Halder, are presently engaged. The change in brass ware work occurred for the conservative mentality of Kansaris and unwillingness of their successors.

Smooth Exploitation of Kansari

The scenario of brassware production had changed when it was used in huge quantity by the common people for their cash crop production requirements. In the pre-colonial period, therefore, the Kansari artisan enjoyed considerable independence. Buchanan's description of the Dinajpur Kansaris clearly shows that this autonomy of the artisans was largely unaffected even up to the beginning of the nineteenth century.[11] The artisans of this field migrated from one place to another place with the emergence and engagement of *Mahajans* in brass ware production. Except Khara and Bishnupur, each of these pre-colonial centers not only maintained its earlier position but also expanded under colonial rule. For instance, Maldah came to have a new settlement of Muslim braziers in the outskirt of its old Kansari locality (Kansaripara). In 1924, the new settlement had one thousand braziers actively engaged in the manufacturing of brass wares. The Nabadwip industry owed its growth to the increasing flow of pilgrims from different parts of Bengal, encouraged by railways in the late nineteenth century.[12] The growth of Calcutta as a city induced the Kansaris from Jessore, Nadia, Burdwan, Murshidabad and Khulna to come and settle here.[13] This migration took place mostly in the early colonial period with low-caste outsiders later joining the industry as cheap labours. Number of new settlements of braziers thus emerged in the city.

An analysis of the distribution pattern of the utensil industry under colonial rule also points to its expansion. Without going into detail and ignoring marginal differences, we can readily distinguish between two types of centers of the utensil industry in the late nineteenth century Bengal. The first comprises the more numerous pre-colonial centers, thus playing a more important role in the industry. The second group comprises fewer but larger centers, which we can call later settlements, emerging during the colonial period. These centers were characterized by an altogether different type of production organization. Nabadwip, Maldah, Dacca, Khagra(Murshidabad) and Bishnupur belong to the first category. Each of them had a distinct history of development. For instance, the origin of the utensil industry at Maldah dates back to the early sixteenth century, when Kansaris of Saptagram first moved to that place.[14] Placed on a river route connecting it to the larger parts of Bengal and Bihar, Maldah offered an excellent opportunity for this industry to grow. From this place the industry eventually spread to Dinajpur and Rangpur in the north and Dacca in the east. Similarly, Nabadwip's association with brass and bell-metal manufacture dates back to the early Vaishava days.[15]

The Kasnsri artisan began to lose his independence slowly till he was completely subordinated

to the merchant of his own caste. Throughout the nineteenth century, the magnitude of the changes was of such a nature that most of the Kansari units in the early twentieth century Bengal conformed to this type.[16] Smritikumar Sarkar's observation is quite different in present perspective as the present article.

It seems, the process of subordination first started with the non-Kansari low-caste workers, who had lately joined the utensil industry. It was in their urge to have a workshop of their own in the context of an expanding market demand that they had cast in their lots with the Kansari merchant. The inducement for the merchant, on other hand, to come to an agreement with these workers was that it reduced their production cost and so raised the margin of their profit because, non-Kansari workers were cheaper than Kansari artisans.

The abundant supply of cheap labour thus enabled the Kansari merchants to drive down purchase prices so low that the income of the hereditary Kansari artisans continued to decline. An enquiry into the artisan's real income position, assessed in terms of the *Khoraki* requirements, shows the extent of this decline since the early nineteenth century. All this happened in spite of the growth of the Kansari's industry.[17]

Transport system :

One reason behind the emergence of Nabadwip Kansari is good quality of transport by river through Bhagirathi to Calcutta and other places. Before the invention of railways the river was most important transport system which flourished the brass metal industry of Nabadwip. The utensil industry had been also stimulated by railway. The existing system of transport by discouraging the movement of utensils, which had a low value relative to the weight and bulk, had actually restricted the Kanasari activities to places with easier river communication.[18]

The production of Brassware:

As a large production centre Nabadwip had spread its name in Bengal in pre-colonial and colonial period. Some of the researchers deal with the production of brassware in several times. In the same time other production centres of Bengal produce large scale of brassware. The growing demand for utensils in Calcutta had a rejuvenating impact on pre-colonial centers as far as Nabadwip and Khagra, Calcutta thus received 25,000 mounds of wares from Nabadwip per year.[19]

In my observation it is found that from the medieval times today the present traditional or virgen Kansari groups continued their business with little changes. Kansari group gradually shifted their position from manufacturing group to traders group. The higher profit in trade thus discouraged direct investment of capital in production, which was left entirely to the care of artisans. A case in point is Gurudas Das of the early nineteenth century Nabadwip.

Born in a Kansari family, he started his career by offering *dadan* to local braziers and soon came to control the entire local trade in utensils. Eventually, he extended his business to all the leading centers of utensil manufacture, possessing 360 *arats* (godowns) with an average income of five thousand rupees per day.[20]

Related artisans in manufacturing

One such feature was the increasing specialization of functions. Instead of the earlier system of the artisan himself doing most of the jobs, the Kansari workshop now came to be built upon a distinct demarcation of functions. Even a moderate Kansari workshop in the mid-nineteenth century would thus consist of a *Grander* (Designer), *Dharandar* (Forgeman), *Pasisdar* (An assistant), *Chachandar* (Finisher), *Kudandar* (Chiseller), *Tanandar* (Lattheman), and five or six *Pitandars* (Hammerers). The small mahajans changed their production procedure by engaging two workers instead of six persons. There is not a single factory to manufacture employing over three to four workers. But in colonial period huge number of workers worked in factories. For instance, the Kangasabanik trader, Krishnamani Pramanik of Khararn in Midanpore had more than hundred workers in his factory.[21]

In conclusion:

The non-Kansari group of Nabadwip tries to survive today upon hard labour. The Kansabanik's role as a merchant became more important than his earlier function as a fellow-member of the *Kansairi* organization. In fact, the growing power of the caste merchant and the consequent expansion of these crafts were both a cause and an effect of the dissolution of the *gain*. An important factor impending the *Kangasabanik*'s transition from a merchant to an industrialist was his social aspiration. On the other hand, it is very sad that the non-kansari does not involve their successor in this work due to indefinite future. So it will be dislocated quite later absolutely.

Notes and References :

1. Sarkar, S. (1994). ''From autonomy to subordination : a study of the changing organization of artisanal production in colonial Bengal : the cases of the Kansaris and the Sankharis''. (B. B. Chaudhuri, Ed.) *The Calcutta Hisotrial Journal , XVI* (2), 111.
2. *Ibid*, p. 106
3. E.F.O. Murray. (1940).'The Ancient Workers of Western Dhalbhum,' in Journal of the *Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI, pp. 81-87, R.J. Forbes, *Metallurgy in Antiquity*, (Leiden, 1950), p 131 ; H.K. Nakvi, *Urban Centers and Industries in Upper India*, 1556-1803, (*Bombay, 1968), p.223, S.K. Maity, *Economic Life in Northern India*, (Delhi, 1970), pp. 132-133, S.K. Sarkar, '*From autonomy to Subordination: a study of the changing in colonial Bengal : the cases of the Kansaris and the Sankharis'*, (University

of Calcutta-1994), p. 106.

4. A. Roy, (2010), 'Madhyajuger Bharatiya Sohor' Vol. 7, *Ananda Publication*, Kolkata, p. 153. (A. Roy deals with the decline the city of Tamraplipta by the changing of river Saraswati and Rupnarayan.)
5. A. Roy (2010), 'Madhyajuger Bharatiya Sohor' Vol. 7, *Ananda Publication*, Kolkata, p.154. (A.Roy's observation that in 1530, Saptagram was beginning the decline. The Partugeje corsair annex at the sea shore of Bhagirathi. From that time the entry point of the river was very disturb for political agitation. Importance of Bhagirathi was decline when the Mughal Emperor and the King of Orissa were engaged them a penetrated war. In this time the artisan groups converted their religious ideology in to Baishnavism.)
6. S.K. Sarkar. (2005), 'Bhabanipur : Prak Aupnibeshik Kolkatar Pratham Shilpakendra' in W.A. Mahamud (ed), *Itihas Anusandhan*, Vol. VI, pp. 166-117, in Begali.
7. H.H. Risely. (1892*)*. The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary, Vol. I, Printed at the Bengal secretariat Press, Calcutta, p. 135. The Sub-caste of Kayeth-Tanti denotes the group of scribes who had later on joined the weaver's occupation. The sub-castes of Kathure-Tanti, Chamar-Tanti and Majhi-Tanti suggest similar groups of worked-cutters, leather-workers and boatmen respectively later on having deserted their original occupation in favour of the weaver's occupation.
8. Sarkar, Smritikumar, *op. cit*., p. 111.
9. T.N. Mukherjee, (1894), Monograph on the Brass and Copper Manufactures of Bengal, Calcutta, 1894, p. 27.
10. The Kansaris of Nabadwip still follow this ritual. Professional interview with Sridhar Mandal and Kalikrishna Mandal, March, 2018.
11. Buchanan-Hamilton. F.A, (1833). 'Geographical, Statistical and Historical description of the District of Zila of Dinajpur in the Province or Subha of Bengal,' Secretariat Press, Calcutta, 1833.p.287.
12. Sarkar, Smritikumar, *op. cit*., p. 116.
13. Das. B. (1331 Bengali) '*Adam Sumari*' in KBP, Vol. I, No. 1, Appendix; E; Vol. II, no. 3, pp. 116-117.
14. J.N. Kangsabanik (1330 Bengali). 'Noakhalir Patra' in *Kansa Banik Patrika*, Vol. I, No. 1, p. 4.
15. A. Karim, Dacca. (1979) The Industrial Evolution of India in Recent Times, 1860-1939, Delhi, p. 6.
16. Sarkar, Smritikumar, *op. cit*., p. 125.
17. 'K.L. Datta. (1915), Report on the Enquiry into the rise of prices in India. Calcutta, p. 174. (Khokari is a Bengali colloquial meaning the amount of rice required by a worker for the sustenance of his family. The rice being staple food naturally claimed the lion's share of

his monthly income. The Data Committee on prices stated that between 1895 and 1915' … the income of wage earners has generally increased much fatter than their cost of living resulting in a substantial improvement in their material condition especially agricultural, general labourers and artisans.)

18. Most of the traditional centers of this industry namely Saptagram, Nabadwip, Dacca, Mahdmudpur, Khagara stood on important rivers.
19. Govt. of Bengal. (1939). Report of the Statistical Bureau *Brass and Bell Metal Industries of Bengal*, Calcutta, p. 7.
20. K.C.Nath. (1331 Bengali) 'Kangsabanikdiger Bartaman Durabashar Karan O Tahar Pratikar', *Kangsa Banik Patrika*, Vol. II, no. 4, pp. 168-170.
21. E.W. Collin. (1892). *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, Calcutta, p. 4.

Alok Kumar Biswas
Asst. Professor, Dept. of History
Vivekananda College, Madhyamgram
Kolkata-700129

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 16, No. 2, December 2019

Published by Dr. Somnath Bandyopadhyay, Teacher-in-charge,
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only